কমল চৌধুরী

সায়গনের নরকে

আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০-০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীভারতী প্রেস
১০৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ :
পরিমল চৌধুরী

মূল্য বার টাকা

SAIGANER NARAKE
(Story of Thieu's Prisons
In South Viet Nam)

Rs. 12·00

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কত ঘৃণ্য হতে পারে তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

শ্রীদীপক দে
বন্ধুবরেষু

এই বইএর কোন চরিত্র,
ঘটনাস্থান কাল্পনিক নয়।

ইন্দোচীনের পূর্বতটে ভিয়েতনাম। দেশটি ছিল ফরাসী উপনিবেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দখল করে জাপানীরা। যুদ্ধ শেষে ফরাসীরা আবার হারানো উপনিবেশে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ভিয়েতনামের বীর জনতা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। ১৯৪৪ খৃঃ মুক্তি যোদ্ধাদের আক্রমণে টনকিনের দিয়েন বিয়েন ফু-তে অবস্থিত ফরাসী গ্যারিসন বিপর্যস্ত হয়। অবস্থা প্রতিকূল দেখে ফরাসীরা হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু রক্তপাত বন্ধ হল না ভিয়েতনামে। বিভক্ত ভিয়েতনামকে একত্রীকরণের জন্য নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয় নি। প্রগতিশীল শক্তির বিজয় সম্ভাবনায় শঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ করে। তারা যুদ্ধে ঢুকে পড়েছিল মাত্র দশ থেকে কুড়ি হাজার উপদেষ্টা নিয়ে। পরে মার্কিন সৈন্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দশ লক্ষ। সেই থেকে মানবতা ধর্ষিত এই ভূখণ্ডে।

জলেস্থলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চলল বছরের পর বছর। পারমাণবিক বোমা ছাড়া আর সব রকম অস্ত্রই নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাণ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশু। ভিয়েতনামের বসত বাড়ী আবাসিক এলাকা, কলকারখানা, শস্যখেত, বাঁধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গির্জার ওপর নির্মম বর্ষাধারার মত বোমা বর্ষণ করেও ভিয়েতনামীদের দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে মার্কিন আধুনিক অস্ত্র ও বর্বর অত্যাচার। বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখল পশুশক্তির তাণ্ডব।

মার্কিন প্ররোচনায় ইন্দোচীনের দুষ্টগ্রহ থিউ স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে নারকীয় কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। বিশ শতকের আলোকিত সভ্যতার দিনে থিউ-এর লোমহর্ষক পাশবিকতার কাহিনী আদিম যুগের বর্বরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মূলত থিউ প্রশাসন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছায়ামাত্র। এর নিজের কোন ক্ষমতা নেই। ভিন্ন মতাবলম্বীদের অবদমনের জন্য যত প্রকার

নিপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব তার কোনটিই বাদ রাখা হয় নি। চুয়াত্তর সালে প্রায় বাইশ হাজর রাজনৈতিক কর্মীকে গুম এবং দশ লক্ষাধিক লোককে বলপূর্বক কনসেনট্রেন ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। তা ছাড়া প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের আগে দ্রুততার সঙ্গে দু লক্ষ লোককে কারান্তরালে পাঠান হয়।

মার্কিন সাহায্য গড়ে ওঠে শত শত জেল খানা, কনসেনট্রশন ক্যাম্প, ষ্ট্রাটেজিক হ্যামলেট আর পুলিশের নির্যাতন কেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে শিকার হতে হয়েছে মার্কিন ও আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত জহলাদদের হাতে।

মার্কিন সাহায্য অবশ্য শুধুমাত্র ডলার প্রবাহের মধ্যে সীমিত ছিল না। প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও সায়গন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়েছে ৫০০ যুদ্ধ বিমান ও হেলিকপ্টার, ৬০০ ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ী, ৬০০ ভারী কামান এবং বহুসংখ্যক মার্কিন যুদ্ধ বিশারদ থেকে যায়। এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে চব্বিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। এই ছদ্মবেশী ঘাতকের হাতে প্রাণ দেয় বহু লোক।

যুদ্ধের ভিয়েতনামীকরণের নীতি সোৎসাহে অনুসরণ করে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে এবং তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতি গোয়ারের মত অনুসরণ করে, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রকাশ্যে হরণ করে এবং জাতীয় মিলনের দাবী অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে থিউ সরকার নিজের কবর নিজে খুঁড়েছে। কারণ, যে-ই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তাকেই ব্যর্থতার ফলভোগ করতে হয়।

ভাড়াটেদের শিকার
এক কিশোর

দেশপ্রেমের পরিণতি

খড়ের চালায় লাইটার দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে একজন সৈন্য

সাযগনে বিক্ষুব্ধ যুব সমাজ

উন্মত্ত গুণ্ডাবাহিনী

বাঘের খাঁচা

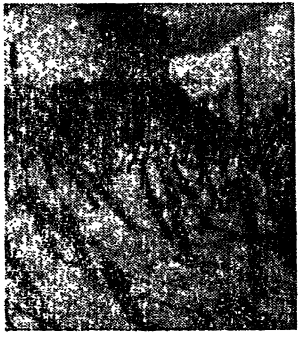

ষ্ট্রাটেজিক হ্যামলেট

নির্যাতনের নিদর্শন

দেশপ্রেমের পরিণতি

গিলোটিন

সব হারানোর বেদনা

দেশপ্রেমের পরিণতি

বীভৎস নির্যাতনের নিদর্শন

দেশপ্রেমিকদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হত্যার উদ্দেশ্যে

এক

সত্যিই আমি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলাম। যিশুর ওপর অত্যাচার আমরা জেনেছি। আর যিশুর অনুসারীরা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমার যৌবন, আমার পৌরুষ, আমার স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে দানব সন্তানেরা। হারিয়ে গেছে আমার প্রিয়জন। আমার মাতৃভূমির সোনালী মাটি!

উঃ কী দুঃস্বপ্নেই না কেটেছে সে সব দিন!

ভাবতে পারি না, এই মুক্ত দুনিয়ার আলো বাতাস আবার দেখতে পাবো। জানতে পারব, দেখতে পাব শ্যামল মাটির মুখ! আবার এসে দাঁড়াব—

না, ঠিক বলা হল না! আর আমি আগের মত দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারব না কোন দিন। যতদিন বেঁচে থাকব এক বিভীষিকাকে বুকে টেনে বেড়াতে হবে আমায়।

আমার দুটো পা-ই শক্ত হয়ে গেছে। দুটো হাতে ভর দিয়ে উঁচু হতে পারি মাত্র। অত্যাচারে আমার মুখের চেহারা বদলে গেছে। আমার দেহের কোন হাড়ই অ-ভগ্ন নেই।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের জেলখানায় আমার কেটেছে ছয় শত দিন। এক নরক! উনিশ'শ সত্তরের বিশে ফেব্রুয়ারী আমাকে ওরা ধরে। আমাকে আঘাতে আঘাতে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। জ্ঞান ফিরে আসার পর বুঝলাম, পা'দুটো আর বেশীক্ষণ আমার ভার বহন করতে পারবে না। কোমরের নীচে কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছে মারাত্মক ভাবে। কান দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে। তাকে বন্ধ করা হয়েছে তুলো গুঁজে।

চোখ খুলেই দেখি, আমার সামনে দুজন মার্কিন সৈন্য। ওদের একজন দোভাষীর সাহায্যে জিজ্ঞাসা করল :

—তোমার নাম কী ?

অপরজনের প্রশ্ন—কোথায় এবং কখন তোমাকে ধরা হয়েছে ?

আমি চোখ বুজে ভাবতে থাকলাম। মনে হল, ওরা নিশ্চয় আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি আমার মাথা নোয়াব না।

এসব দেখে শুনে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার ঘৃণা হল। তখন ওরা আমায় স্ট্রেচারে করে নিয়ে চলল পিটুনি ঘরে।

একজন মার্কিন সৈন্য চেঁচিয়ে বলল, তুমি কালা সাজবার চেষ্টা করছ, না ? শয়তান কোথাকার ! কিন্তু ডাক্তার বলেছে তুমি কানে বেশ ভালই শুনতে পাও। কিন্তু দেখ কি সব আছে এখানে ? তুমি যদি পাথরেরও হয়ে থাকো, তাহলেও সাড়া দেবে। কথা বলতে তুমি বাধ্য হবে।

সেখানে ছিল তীব্র আলো নিক্ষেপক ল্যাম্প, নিষ্ক্রিয়কারক যন্ত্র, ধমনীর গতিবর্ধনকারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র ; তাছাড়া আরও নানা ধরণের বীভৎস নির্যাতন চালাবার উপযোগী যন্ত্রপাতি।

কিন্তু আমি নীরব। সে আমার মুখের ওপর আলো ফেলল। হঠাৎ সে আলোর বেগ দিল বাড়িয়ে। আলোর জোর ছিল এত তীব্র যে আমি কাঁপতে থাকি ! মনে হল মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত আমি। মনে হল সেই আলোর ছটা গিয়ে আমার মাথার খুলি পর্যন্ত পৌঁচেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

একসময় শুনতে পেলাম সেই ইয়াঙ্কী আমায় ঠাট্টা করে বলছে—তুমি কী গরম হলে ?

যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন দেখি আলো নেভানো আর ও বলল, তুমি কি সুস্থবোধ করছ ?

চোখ খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি। আমেরিকানটার হাতে রবারের দস্তানা। আমার মুখে ঘুষি চালাল উন্মত্তের মত। আমার ঠোলা পড়া মুখ ফেটে রক্ত ঝরতে থাকল।

ইয়াঙ্কিটা ষাঁড়ের মত চেঁচাতে থাকল—ওঠ, বেটা উঠে পড়। ওঠ-ওঠ-ওঠ—

আমার বুকে, পেটে, ঘাড়ে সেই সংগে চলল সবুট লাথি। আমার বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে দুপায়ে দলাই মালাই চলল।

ওদের একজন চেঁচিয়ে বলল, থাম, থাম, মনে হচ্ছে শুয়ারের বাচ্চাটা মরেই গেছে। মনে হল, তখন দোভাষীটা একজন ডাক্তারের খোঁজ করছে।

কয়েকদিন বাদে আবার জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হল। আমার কাছ থেকে কোন খবরই তারা বের করতে পারল না। এমন কি আমার পরিচয়টুকু পর্যন্ত নয়।

আমি পরে জেনেছিলাম, নুঅক নান বিমান ঘাঁটিতে এইসব সি আই এ দস্যুরা আমার সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট নিয়েছিল একেবারে শূন্য। সেই হল আমার প্রথম জয়।

তখন আমাকে পাঠান হয় দানাং-এ ফার্স্ট আর্মি কোরের সেকেণ্ড ব্যুরোতে (গোয়েন্দা)। এখানে কাজ হল বন্দীদের কাছ থেকে যেকোন ভাবে স্বীকারোক্তি বের করে তাদের ওপর আক্রমণ চালান।

প্রথম দিন ওরা আমাকে লাঠি পেটা করে। আমি আমার বুকটা বাঁচাবার চেষ্টা করায় ওরা আমাকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধে। তারপর আবার মারতে থাকে। সবসময় আমার মধ্যে একটা চিন্তা প্রখর ছিল যে ভাবেই হোক ফুসফুস দুটো বাঁচাতে হবে। তখন ওটাই আমার একমাত্র প্রয়াস। আমার চোখের জল গেছে হারিয়ে। জ্ঞান হারালাম।

সেই দিনই ওরা আমাকে নিয়ে যায় পিটুনি ঘরে। সেখানে নির্দেশ এল আমার শরীর থেকে রক্ত বের করে নেওয়ার। বোতল আর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আনা হল। পুলিশের এক ক্যাপ্টেন আমার স্ট্রেচারের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল :

—তুমি কেন মুখ বুজে আছ ? আমরা চাইছি না, কিন্তু তুমি আমাদের নোংরা পথ নিতে বাধ্য করছ।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম, এই নোংরা চাকুরীর জন্য তোমরা তো মাইনে পাচ্ছ ?

সে আমার মুখের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি ঝাড়ল। ফলে কিছুক্ষণ ধরে আমার নিশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হল। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত দেখলাম, আমার রক্তে ওদের বোতল ভর্তি হচ্ছে।

এক সপ্তাহ পরে, ওরা আমাকে নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আমার দেহের আঘাতগুলো বেশ ফুলে উঠেছে। শুকোন রক্তের আশটে গন্ধ। মাছি উড়ছে তার ওপর ঝাঁক বেঁধে। সমস্ত গায়ে মলমূত্র মেখে বীভৎস গন্ধ, কেটে যাওয়া জায়গা থেকে রস গড়িয়ে পড়ছে।

নাকচেপে ধরে এগিয়ে এলেন আমার প্রশ্ন কর্তারা। ওরা একজন নার্সকে ডেকে আমার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে নির্দেশ দিল, তারপর চারজন আমাকে ঘিরে বসল।

তাদের একজন বলল, আচ্ছা, মিঃ টি তুমি আমাদের একটা কথার উত্তর দাও। তোমাকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি। কবে থেকে তুমি পার্টি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ?

আমি বললাম—আমার নাম ট্রান আন, টি নয়। আমি চাষী। তোমাদের কেবল বলতে পারি কিভাবে চাষ করতে হয়। আমি ঐ ডিস্ট্রিক্ট কমিটির ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানি না।

ওরা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করল।

একজন বলল, এই শুয়োরের বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা কি করি বল তো।

আর একজন তার চূড়ান্ত মত দিল, ওকে পিটিয়ে মেরে ফেল।

ওকে সাবমেরিনে ভ্রমণ করালে কেমন হয়? একজন পরামর্শ দিল।

স্তোৎসাহে সমর্থন জানাল সকলে।

একজন খুনী বলল, তোমার সাবমেরিনে চড়তে কেমন লাগে?

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম, আমি জীবনে কখনও ওতে চড়িনি।

কথা শুনে ওরা বিশ্রীভাবে হেসে উঠল। বলল, আমাদের সাবমেরিন তোমার কেমন লাগছে, একবার বলবে কিন্তু।

ওরা আমার হাত-পা বাঁধল। আমার ফুলে ওঠা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। তার ওপর এই দড়ির বাঁধন সৃষ্টি করল তীব্র বেদনার। আমার চোখ ঢেকে দেওয়া হল কাপড় দিয়ে। আমায় জোর করে খেতে বাধ্য করল রোগ বীজাণুনাশক পদার্থ, রক্ত, লাল মরিচ এবং মলমূত্রের এক কদর্য মিশ্রণ! নগো দিন দিয়েমের আমলে এই ধরনের নির্যাতন হত জানি। এখন মার্কিন উপদেষ্টারা তার আরও উন্নত সংস্করণ করেছে!

এক ঘণ্টা পরে, আমার পেটটা ফুলে উঠল ঠিক বেলুনের মতো। জহ্লাদগুলো আমার পেটের ওপর লাফাতে থাকল তাদের ভারি বুট দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি যা খেয়েছিলাম সব বমি করে ফেললাম।

তারা শাসানির সুরে বলল, এবার তুমি কথা বলবে?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

ওরা হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একজন ক্রুদ্ধ মেজাজে বলল, ওকে দানাং পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও।

ওরা অবশ্য শেষ পযন্ত তাই করল। আর আমার কাগজপত্রে লিখে দিল, 'এক অবাধ্য ব্যক্তি'।

দানাং পুলিশ হেড কোয়ার্টার 'দুর্ধর্ষ' অপরাধীদের জন্য বিশেষ-ভাবে সংরক্ষিত। এখানকার বেতনভোগী জহ্লাদদের আমেরিকায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

যে ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেখানে ছিল অবর্ণনীয় ভয়াবহ দৃশ্য। ছাদের সঙ্গে ঝোলানো একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। ঘরের এক কোণায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ একজন মহিলা রক্তের মধ্যে পড়ে।

টেবিলের ওপর নির্যাতনে ব্যবহারযোগ্য সব যন্ত্রপাতি। সাঁড়াশি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ···দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা : 'যতক্ষণ সাড়া না দেয়, ততক্ষণ ওদের পেটাও।'

তখন আমার মনে একটা চিন্তাই ঘুরছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আজ এক ভয়ংকর নির্যাতনের মুখোমুখি। এর হাত থেকে রক্ষা পেলে, ভবিষ্যতের যে কোনো অত্যাচারকেই আমি সহ্য করতে পারব।

ইউনিফর্ম-পরা দু'জন পুলিশ এলো। ওরা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। একজন জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি পছন্দ কর, সাবমেরিন না আকাশযান?

আমি বললাম : এসব তো করেছিল সৈন্যবাহিনীর লোকেরা। ওরা আমাকে লাল মরিচের ঝোল খাইয়েছিল।

পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল—ও, ওরা তোমায় তাহলে সাবমেরিনে চড়িয়েছে। এখন তাহলে রুচি বদল কর বিমানে চেপে।

পুলিশ দু'জন বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকল ছয়জন পেশাদার খুনী। ওদের চেহারা বীভৎস রকম কুৎসিত।

একজন বলে উঠল, আমরা কে জানো ?

আমি বললাম, থিউ-এর এজেন্ট।

সে বলল, আমরা পেশাদার খুনী। ছাদ থেকে ঝুলছে ঐ বুড়ো বানরটা, আর নীচে পড়ে আছে প্রায় মরে যাওয়া কুত্তীটা। তুমি বুঝতে পারছ ওদের ওপর কেন নির্যাতন চালানো হয়েছে।

কারণ ওরা দেশপ্রেমিক—আমি বললাম।

ও, তুমি দেখছি রাজনীতিতে পোড় খাওয়া। বেশ, আমরা তোমার বিমানযাত্রার ব্যবস্থা করছি।

ওরা আমার পিছন দিকে হাত দু'টি ঘুরিয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলল। বৃদ্ধ লোকটির জায়গায় নিয়ে আমাকে ঝোলালো। ওঃ সে কী যন্ত্রণা। বাঁধা দু'খানি হাতে ঝুলছিলাম। নিঃশ্বাস নিতে ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ওপর চাপ পড়ায়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসছিল। কটুস্বাদের একটি তরল পদার্থ আমাকে গিলতে হলো। দেহের ভিতরের সব কলকব্জাগুলো যেন নেমে যাচ্ছিল ক্রমশঃ নীচের দিকে। তখন আমার আচ্ছন্ন অবস্থা। গুণ্ডাগুলো তখন বলাবলি করছেঃ শুয়োরের বাচ্চাটা মরে যাচ্ছে। ওটাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনো।

ওরা আমাকে স্ট্রেচারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। হাতের বাঁধন খুলে দিলো। কিন্তু বাঁধন এত শক্ত যে, হাতদুটো অনড়। একজন নৃশংসভাবে সে দুটো জায়গা ঠিক করে দিলো। ওরা আমায় নিয়ে গেলো একখানি ছোট্ট ঘরে। সিমেন্টের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর ফেলে দিলো। সেখানে ঘর থেকে পালাবার উপযোগী কৌশলী ফাঁদ পেতে রেখেছিলো ওরাই। দেওয়ালের গা থেকে গড়িয়ে পড়ছিল লবণ জল। সেই জল আমার গায়ে লেগে সৃষ্টি করছিল তীব্র যন্ত্রণা। আমি তখন শক্ত পাথরের মতো হয়ে পড়েছি। ঘরটাও এত ছোট যে আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র নড়াচড়াও ছিল অসম্ভব।

প্রতিটি লবণ জলের ছোঁয়ায় আমি কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম। আর তীব্র যন্ত্রণায় কেঁদে উঠছিলাম। উৎকট অন্ধকার আমার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেয়।

তখন আমি সম্পূর্ণ নগ্ন। হাটতে পারি না। কিন্তু তারপর ওরা আমাকে দানং-এর শহরতলীতে কুয়াং নাম পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠায়। পাঠাবার সময় আমার হাতে হ্যাণ্ডকাফ আর আমার পায়ে ভারী শিকল পরিয়ে দেয়।

ডিউটির পুলিশটি আমার কাগজপত্র দেখে মার্কিন উপদেষ্টার হাতে দেয়। পুলিশটি ওকে বলল, এই লোকটি অন্যতম ডিস্ট্রিক্ট লিডার। কোন রকম অত্যাচার এর মুখ খুলতে পারে নি। আমার মনে হয় একখানি পা কেটে নেওয়া ভাল। তাহলে, এ আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইয়াঙ্কিটি মাথা নাড়ল। তারপর ওরা আমার ফটো নেওয়ার চেষ্টা করতেই, আমি দু'হাতে আমার মুখ ঢাকলাম।

পুলিশটি বলল, নানা ওরকম কারো না। এ ফটো নেওয়া হচ্ছে তোমার ফুড কার্ডের জন্য।

আমি বললাম, গত পাঁচদিনে আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। তার আগে ঠিক ডিমের আকারের দুটি ভাতের দলা পেতাম প্রতিদিন। আর তার জন্যে আমি ফটো দেবো?

এখানেই সর্বপ্রথম আমার ওপর রাতে নির্যাতন চালান হয়।

খুনীগুলো প্রথমে আমার সঙ্গে রসালাপ শুরু করে।—দেখো তোমাকে আর পেটাবার মত মন আমার নেই। তুমি কেন ঘটনা-গুলো স্বীকার করছ না।

—কি ঘটনা?—আমি জানতে চাইলাম।

—তুমি তো একজন ডিস্ট্রিক্ট লিডার? তুমি এটুকু স্বীকার কর।

ওরা আমাকে কিছু অন্য ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি দেখাল।

আমি ঠাণ্ডাভাবে বললাম, এসব স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়েছে অত্যাচার চালিয়ে। আমি একজন ডিষ্ট্রিক্ট লিডার? সত্যিই, তোমরা আমাকে বেশি সম্মান দেখাচ্ছ। ডিষ্ট্রিক্ট লিডার হতে অনেক যোগ্যতার দরকার। আর আমি কিনা একজন সাধারণ চাষী। তোমরা জোর করে আমি যা নই, তা আমাকে দিয়ে বলাতে পারবে না।

—তুমি আবার রাজনীতির কথা বলছ। ঠিক আছে। এবার আমরা দেখছি।

ওরা একটি ছোট ইলেকট্রিক জেনারেটর নিয়ে এল। আমার পুরুষাঙ্গে তার জুড়ে দিল। কিন্তু ইঞ্জিন চালাল না। ওরা আমার দুটি হাত ধরল। ছোট, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে প্রতিটি আঙ্গুলের মাথায় মাংসের মধ্যে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। যন্ত্রণায় আমি জ্ঞান হারাই।

একজন বলছিল,—ওরে শয়তান কমিউনিস্ট, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!

আমার শরীরে হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড শক্তি এল। আর আমি ওকে ফেলে দিলাম একধাক্কায়!

ঘটনাটি ঘটল তখনই, যখন আর একজন খুনী জেনারেটর চালু করেছে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

আমাকে সায়গন পুলিশ হেড কোয়ারটারের থাম বিন শাখায় নেওয়া হল। এখানকার বৈশিষ্ট্য হল মস্তক ধোলাই।

একদিন সাদা পোশাক এবং সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে একজন প্রশ্ন কর্তার মুখোমুখি হলাম। সে এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে ধরল।

—ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই না।

—তা হলে ফ্যানটা চালিয়ে দেই।

—যা খুশি কর। আমার কিছু যায় আসে না।

সে তার ছোট্ট ভাষণ শুরু করল।—দেখ সত্যি আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি একটা খারাপ কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছ। তোমাকে যদি এখন নিজের গ্রামে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তুমি যাবে অক্ষম মানুষের মত। তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার! তোমার মালিকরা এ নিয়ে ভাবেও না। তার থেকে, তুমি আমাদের কাছে সত্যি কথা বললে, তোমার সব ধরণের চিকিৎসা হবে। আমাদের সোস্যাল সার্ভিসের লোকেরা, তোমার পছন্দ মত, যে কোন ব্যবসা চালান শেখাবে। যার ফলে তুমি মোটামুটি ভালই রোজগার করতে পারবে। আমাদের আর নির্যাতন চালাতে বাধ্য করো না। যদি গররাজী হও, আমার নির্দেশ হল, তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে তোমার দুখানি পা-ই কেটে দেওয়া হবে।

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আমাদের পিতৃভূমি আজ বিধ্বস্ত। তোমার মত আমেরিকানরা আমাদের জনগনকে খুন করছে, সায়গণ কর্তারা তোমাদের দক্ষিণ ভিয়েতনামে ডেকে এনেছে। এটা একটা জঘন্যতম অপরাধ।

সে বলল—তুমি যে সব কারণে অভিযুক্ত সেগুলি কি তুমি স্বীকার কর?

—আমাদের দেশের বিরুদ্ধে আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি। কোন অপরাধই আমি করতে পারি না।

তোমাদের চোখে অবশ্য আমার দেশ ও জনগণের প্রতি প্রেম একটা অপরাধজনক ব্যাপার।

কথা এড়িয়ে গেল পুলিশের লোকটি। সে বলল, 'দেখ তোমার কাগজপত্রে নাম আর বাসস্থানের উল্লেখ রয়েছে মাত্র। সম্ভবত

দুটিই ভুল। কারণ, তুমি যদি একজন ডিষ্ট্রিক্ট লিডার না হও, তবে সকলে তা বলে কেন?

—কারণ, আমি বললাম, তারা তোমাদের নির্যাতন সহ্য করতে পারে নি।

ক্রুদ্ধ লোকটি এবার, ওর সামনে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল। আমি প্রচণ্ড বলিষ্ঠতার সঙ্গে বললাম,—তোমাদের মত ভাড়াটেদের সামনে আমি নত হতে পারি না।

ও খেপে উঠল। আমার বুকের একখানি হাড় ধরে নিয়ে ভেঙে ফেলল। আর আমি শুনতে পেলাম তার শব্দ।

সে রাগতে রাগতে বলল,—তুমি সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাবে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারা আঁকড়ে থাকার তাই হবে পরিণাম। তুমি কি এখানে সই দেবে? সে নির্দেশের সুরে জানতে চাইল।

—ওর মধ্যে কি আছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম!.

সে বলল, কিছুই নেই ধরতে গেলে!

ওর হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে আমি পড়তে থাকি। আমাকে অভিযুক্ত করার মত অনেক কিছুই আছে তার মধ্যে।

কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো করে পুলিশটির মাথায় ছুড়ে মারি।

পুলিশটি এবং আরও কয়েকজন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার মাথায় মল ঢেলে দেওয়া হল। আমি জ্ঞান হারালাম। ওদের মারের ধকল সামলানো কঠিন ছিল তখন।

আমি জ্ঞান ফিরে দেখি ওরা একখানি নতুন স্বীকারোক্তি তৈরি করেছে। তার মধ্যে আছে:

নাম: ট্রান আন

বয়স: ৩৪

জন্মস্থান: দিয়েন বিনে

পারিবারিক অবস্থা: অজানা

তার নীচে ওরা নোট দিল : .লোকটি কিছুতেই স্বাক্ষর দেয় নি। সেখানে পুলিশের সীল মারা।

শেষবার আমাকে রাখা হয় নাই আন কারাগারে। সেখানে যতদিন ছিলাম, আমার হাত পা ছিল বাঁধা। বাইরের সঙ্গে কোন সংযোগ ছিল না। ১৯৭১ খৃঃ ১৫ অক্টোবর দুপুরে আমাকে জেলের অফিসে ডেকে পাঠান হয়। আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম, বহু গ্রেপ্তার করা মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয় প্রবঞ্চনার সঙ্গে। বাইরে পুলিশ ওদের খুন করে। আর তাদের লাসগুলো ফেলে দিয়ে আসে। আমাকে ওরা কখনই বিচারের জন্য আদালতে হাজির করতে পারে নি। আমাদের কাগজপত্রে এমন কিছু ছিল না, যার সাহায্যে আমাকে অভিযুক্ত ক'রে সম্ভবত পাউলো কনডোর দ্বীপের চরিত্র সংশোধক কারাগারেও পাঠাতে পারে নি। ওরা অবশ্য চেষ্টা করেছিল। যাত্রার সময় অফিসার ইনচার্জ দেখতে পায়, আমি দুটি পায়ের ওপর ঠিক ভাবে দাঁড়াতে পারি না। সে আমাকে নিয়ে যেতে অসম্মত হয়। এখন, নিশ্চয় ওরা আমাকে হত্যা করতে নিয়ে যাবে!

জেলের ডিরেক্টর আমাকে দেখে মুখ জুড়ে হাসতে হাসতে জানালেন, এখন তুমি মুক্তি পেলে।

—আমাকে ছাড়পত্র দিন, আমি বললাম।

—তার দরকার নেই। তিনি বললেন।

ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম। সেখানে ছিল পাঁচটি দরজা। তৃতীয় দরজা পেরিয়ে দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং হাঁটার গতিপথ ফেরালাম। আমি মুক্তির উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

দুই

সায়গন! দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার রহস্য নগরী সায়গন! অগুন্তি মানুষের ছড়াছড়ি। দেশী থেকে বিদেশী। বিগত পঁচিশ বছরের জীবনে সায়গন অস্থির আতঙ্কগ্রস্ত। রোগাক্রান্ত সায়গন আজ উন্মাদের সংসার শয়তানের কারখানা। রাজনৈতিক উত্থানপতন, হানাহানি আর লাম্পট্যের লীলাভূমি সায়গন!

বিস্তৃত এই শহরে লুকিয়ে আছে অন্তহীন রহস্য। বড় বড় সড়ক ছড়িয়ে আছে শহরের বুকজুড়ে। সেই সঙ্গে আধুনিক জীবন ভোগের অজস্র উপকরণ। পয়সা থাকলে, সায়গনে দুষ্প্রাপ্য কিছুই নয়। আলোর রোশনাই সায়গনের ক্ষতগ্রস্ত চরিত্রকে লুকিয়ে রেখেছে সংগোপনে। আধ মাইল বর্গক্ষেত্র জুড়ে শতুয়েক বার নাইট ক্লাবে জ্যাজের উত্তালতরঙ্গে উদ্দাম সায়গন রজনী।

সুরার আসর নৈশজীবনের প্রমত্ত উল্লাসে সায়গনের জীবন আজ কলুষিত। রহস্যময় আস্তানা গড়ে উঠেছে সায়গনের বুকে অজস্র। নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির বেঁচাকেনা চলে অবাধে। স্টেশন ওয়াগন বা সামরিক গাড়ীভর্তি উন্মত্ত সৈন্যরা চলেছে। সায়গনকে এরাই সজীব করে রেখেছে। সায়গনের প্রাণ যেন এরাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে বিরাট লম্বা চওড়া মার্কিন সৈন্যরা চলত অবিরত। সহজেই চেনা যায় এদের। রূপের আলো উজ্জ্বল মোহিনী সায়গন এদের তুষ্ট করতে ব্যস্ত।

আকাশের বুকে জেট বিমানের গর্জন। নীচে চলেছে সাইকেল, রিক্সা, স্কুটার। হালফ্যাসানের গাড়ি। দুর্বার এদের গতি। অসংখ্য দুর্ঘটনায় ভরা সায়গনের প্রতিটি দিন।

নদীর বুকে অসংখ্য নৌকা। নদী তীরে খাবারের দোকান, রেস্তোরা, বার। একটা গলফ মাঠ আছে এখানে। জলের বুকে নৌকায়ও রেঁস্তোরা। আগে পর্যটকরা আসত উপভোগ করত ভিয়েতনামের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এখন হারিয়ে গেছে সে জীবন।

অজস্র জাহাজ ভাসছে। সবই প্রায় যুদ্ধের উপকরণে সাজান। মুক্ত দুনিয়া গড়বার 'দিব্যিগেলে' এরা এসেছে সাগর পেরিয়ে। সায়গনের টান সান ন্যুৎ বিমান বন্দরে ডজন ডজন মার্কিন রোমারু বিমান, অগুন্তি হেলিকপ্টার। ইউনিফর্ম পরা মার্কিন সৈন্যদের অবাধ গতি। উত্তর আর দক্ষিণে আক্রমণ চালাবার ঘাঁটি সায়গন।

সায়গনের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ বলা যেতে পারে একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এখান থেকে প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভন থিউ গোটা ভিয়েতনামে আগুন ছড়িয়েছেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে স্বদেশবাসীর শত্রুতা করছেন মার্কিন বেনিয়াদের স্বার্থে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের অনুপাতে প্রেসিডেন্ট থিউ যেন মাত্রাতিরিক্ত মার্কিন ভক্ত। থিউ ভিয়েতনামীদের মনোনীত বা স্থানীয় স্বার্থে পরিচালিত শাসকও নন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক তাঁবেদার মাত্র।

একে একে বহুজনকে সায়গনে ক্ষমতায় বসিয়েছে মার্কিন যুদ্ধবাজরা। যাকে পছন্দ হয়নি, নির্মমভাবে সরিয়েছে তাকে। প্রেসিডেন্ট থিউ সাম্ভবত ওদের সব থেকে পছন্দসই মানুষ।

থিউ ক্ষমতা হাতে নিয়েই নির্যাতন আর নিষ্পেষণের স্টিম-রোলার চালাতে থাকেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার সমাধি ঘটেছে অনেকদিন আগেই। মার্কিন ও পুতুলশাসকরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে করে তুলেছে উপহাসের বস্তু। ১৯৬৯ খৃঃ প্রথমেই

সায়গনের ৩০টি পত্রপত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। যেকটি প্রকাশের অনুমতি পায়, তার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ। মন্ত্রি-সভার বহু সদস্যকে বিতাড়ন করে সামরিক ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয় সে পদে। ন্যায় বিচারের বালাই নেই। সায়গন প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বাসা। উৎকোচ ছাড়া কোন কাজ হয় না। অবর্ণনীয় নির্যাতন আর দুর্নীতির বন্যায় ভেসে গেছে সায়গনের জনজীবন।

রাত এগারটা থেকে সান্ধ্য আইন শুরু। সঙ্গে সঙ্গে সায়গনের বুক জুড়ে নেমে আসে ত্রাসের আতঙ্ক। পুলিশের গাড়ীগুলি বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে চলে তল্লাসী। সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক বা কমিউনিস্ট সন্দেহ হলে রক্ষা নেই! সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গাড়ীতে। অভিযোগ বা সন্দেহের কোন মাপকাঠি নেই। প্রতি রাতে কমপক্ষে দুতিনশ লোককে এইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার মত যাদের পয়সা নেই, তাদের জায়গা হয় কারাগারে। প্যারিস শান্তি আলোচনাকালে গ্রেপ্তারের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাঁবেদার সরকারের সেনাবাহিনী এবং পুলিশবাহিনী দখলীকৃত এলাকায় ব্যাপক লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন রকম প্রতি-রোধের ব্যবস্থা নেই। যে প্রশাসনে আর্দালি থেকে প্রেসিডেন্ট দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত সেখানে এর থেকে বেশী আর কি আশা করা যেতে পারে!

সায়গনের দক্ষিণ-পূর্বে ফুয়েবি প্রদেশের একটি শহর ডাত ডো। সায়গন থেকে মোটরে যেতে ৮০ মিনিটের পথ। এই শহরটিকে মুক্তিবাহিনী দখল করে নেয়। শুরু হল শহরটির ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। ধ্বংসের ধ্বস নামল শহরে। ষোল হাজার মানুষ পরিণত হল বাস্তুহারায়।

বোমাবর্ষনের ফলে মুক্তিবাহিনী ভাত ডো ত্যাগ করে যায়। তাঁবেদার বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। দু একটা বাড়ী যা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, প্রচণ্ড লুটপাট হয়ে যায়। সৈন্যরা আসবাবপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, মোটর সাইকেল সব নিয়ে যায়।

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ লুটতরাজের এবং শহরটি ধ্বংস হওয়ায় পূর্ণদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় মুক্তি বাহিনীর ওপর। এই ধরণের ঘটনা তাঁবেদার অধিকৃত অঞ্চলের সর্বত্র চলেছে। ডাত ডোর প্রত্যক্ষ-দর্শীরা অবশ্য জানায় এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা এসেছিল একটি রাইফেল আর একটি জ্যাকেট নিয়ে। এবং সেইভাবে তারা ফিরেও যায়।

ডাত ডো লুণ্ঠনকারী সৈন্যদের ওপর প্রাদেশিক সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন কাউন্সিলর এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানালে তাদের বলা হয়, তোমরা সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাজে বাধা দিচ্ছ। পরে এই সব কাউন্সিলর পেয়েছিলেন চায়না গ্রাফ পেন্সিলে লেখা চিঠি। তাতে আঁকা হাতবোমা আর কঙ্কালের ছবি।

কোনদিন কোন রাজনীতিতে জড়িত ছিল না, এমন সব মানুষে ভর্তি সায়গনের কারাগার। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৪১টি জেলও অন্তরীণ কেন্দ্রে নিপীড়নমূলক আটক আইনে বন্দী মানুষের সংখ্যা সরকারেরও অজানা। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক করা হলেও, এদের অধিকাংশই নিরীহ শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ।

সামরিক আইন জারি করা হয় ৭২' এর মে মাসে। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বন্দী করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও. তাদের নতুন আইনে আটক করা হয়। ১৯৬৭ খৃঃ প্রেসিডেন্ট থিউ-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ক্রুয়ং দীন জু। তিনি ছিলেন বিরোধী-

দলের নেতা ও কোয়ালিশন সরকার গঠনের পক্ষপাতী। এই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭২ খৃঃ এই ভদ্রলোকের দণ্ড মেয়াদ শেষ হলেও, বাইরের জগতে তিনি এখনও পদার্পণ করতে পারেন নি।

কত মানুষকে যে হত্যা করা হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। গত কয়েক বছর ধরে সাময়িকভাবে দখলীকৃত এলাকায় লোকজনকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হতে থাকে। এই সরকার একের পর এক দমনমূলক আদেশ জারি করে। এখনও সায়গনের কারাগারে আটক আছে ৩ লক্ষেরও বেশী মানুষ।

থিউ সরকার অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এখনও তার রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে অভিলাষী। সরকার বিরোধী মনোভাব ব্যাপক আকার নিতে থাকে তারই ফলশ্রুতিতে। আটক ব্যক্তিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও হত্যাভিযানের জন্যও থিউ সরকার বিরোধী আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। জনৈক বন্দী মহিলা ভাল খেতে চাইলে তার দেহে চুন ঢেলে দেওয়া হয়। ফলে মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। যারা মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করত না, তারা পরে মুক্তিবাহিনীর পাশে দাঁড়াবার কারণও সহজে অনুমেয়।

অত্যাচারী থিউ সরকার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে বার বার। মার্কিন বাহিনীর সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের দখল কৃত এলাকায় থিউ-এর ভাড়াটে সৈন্যরা কমিউনিস্ট দমনের নাম করে খুন শুরু করে। ব্যাপক গেরিলা তৎপরতায় থিউ-এর মার্কিন বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলি ওদের হাত ছাড়া হতে থাকে একে একে। বড় বড় কয়েকটি শহর ঘিরেই থিউ-এর সামরিক ঘাঁটি। সেখান থেকে মার্কিন পরিকল্পনা মত সৈন্য গিয়ে নামে হেলিকপ্টারে করে নির্দিষ্ট কোন জায়গায়। তারপর সুরু করে বোমাবর্ষণ মার্কিন বিমানবহর। জমির ওপর দখল হারাতে

হারাতে তাঁবেদার বাহিনীর অবস্থানের পক্ষে স্থানাভাব ঘটতে থাকে।

প্যারিস শান্তি চুক্তি প্রেসিডেন্ট নিকসনের মান বাঁচায়, আর এবারের মত টিকিয়ে রাখে দক্ষিণ ভিয়েতনামে থিউ-এর কুশাসনের রাজত্ব। মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকারের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে মার্কিন সহায়তায় আজও চলেছে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্মম নির্যাতন। বিপুল সংখ্যক গুপ্তচরে ভরে গেছে দেশটা। ১২০,০০০ পুলিশ বাদ দিয়েও, পার্ট টাইম গোয়েন্দার সংখ্যা কয়েক শ হাজার। রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে কালো গগলস্ পরা মানুষেরা নজর রাখছে প্রতিটি নাগরিকের ওপর।

সায়গনের প্রতিটি পরিবারকে রাখতে হয় 'ব্রাউন বুক'। পরিবারের প্রত্যেকের নাম থাকে এই বই-এ। সায়গনের পুলিশ রাতের বেলা ঘিরে ফেলে বিরাট কোন অঞ্চল। তারপর চলে প্রতিটি বাড়ীতে হামলা। যদি পবিবারের সাত জন লোকের মধ্যে উপস্থিত থাকে ছয় জন অথবা আট জন, তাহলে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অথবা সঠিক উত্তরের পরিবর্তে টাকা। তা না হলে পরিবারের একজনকে হারাতে হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সায়গনের কেন্দ্রীয় কম্প্যুটার ব্যাঙ্কে জমা আছে ১৫ মিলিঅন ভিয়েতনামী সংক্রান্ত দলিলপত্র। পুলিশের এজেন্টের কারো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দরকার হলে সায়গনকে অনুরোধ জানায়।

গ্রেপ্তারের কায়দা কানুনও আছে হরেক রকম। কখনও কখনও পুলিশ যাকে খুঁজতে যায়, সে অনুপস্থিত থাকলে তার বাড়ীতেই থেকে যায় দুসপ্তাহ, তিন সপ্তাহ বা এক মাস। রাস্তার ধারে ক্যাম্প করে থাকে তিন মাস।

এই ব্যবস্থায় "জিজ্ঞাসাবাদের" ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নির্যাতন

চালিয়ে কারো মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, অথবা অন্যকে অভিযুক্ত করা হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংবিধানে আছে গ্রেপ্তারের সময় আইনজীবীর সাহায্য নেওয়া যাবে, কিন্তু কার্যত তা ঘটে না!

অনুরূপ বিচার ব্যবস্থা চলেছে। অধিকাংশ অবরুদ্ধ নাগরিক কোন বিচার পায় না। সিকিউরিটি কমিটি পুলিশের দালালের সাহায্যেই বিচার করে। কোন প্রশ্ন না করে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে রায় বেরিয়ে যায়, দুবছরের সশ্রম শাস্তি! এই মেয়াদ কাল শেষ হলেই, আবার গ্রেপ্তার করা যায়।

সামরিক আদালতে বিচারও অদ্ভুত। পাঁচজন বিচারক পড়েন স্বীকারোক্তি। যা পুলিশের লেখা এবং প্রহার, নির্যাতন সাহায্যে জোর করে সাক্ষরে বাধ্য করা হয়েছে বন্দীকে। প্রতিবাদী এই স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করলে, বিচারক বা অভিযোক্তা তাকে গালিগালাজ করে। সরকার নিযুক্ত প্রতিবাদীর আইনজীবী তাকে পরামর্শ দেয় আদালতের কাছে ক্ষমা চাইতে।

চল্লিশ পঞ্চাশ জনের স্বীকারোক্তি শোনবার পর বিচারকরা চলে যান তাদের চেম্বারে। পনের মিনিট বাদে ফিরে এসে জানান শাস্তি দেওয়া হল—তিন বছর, সাত বছর, দশ বছর, পনের বছর…।

তারপর বন্দী জীবন—খাদ্যের অভাব, নির্যাতন ও প্রহার।

সায়গনের কারাগার দেখতে কাউকে অনুমতি দেওয়া হয় না। রেড ক্রশ, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্য, ডেপুটি বা সিনেটর কারো অনুরোধ রাখবার মত শিষ্টাচার থিউ সরকারের জানা নেই।

চোদ্দ বছর বাঘের খাঁচায় আটক থাকবার পর একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে। ১৯৫৯ খৃঃ

গ্রেপ্তারের আগে তার বিয়ে হয়। একটি সন্তান ছিল তাদের। ওর ধারণা ছিল তারা হয়ত সুস্থ আছে।

দশ বছর পর সে জানতে পারে, তার স্ত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সেও জেলে রয়েছে দশ বছর।

থিউ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব ত্যাগ না করায় আরও চার বছর 'বাঘের খাঁচায়' কাটিয়ে সে ফিরে আসে অবশেষে।

তার স্ত্রী ও সন্তানের খবর পরিবারের কেউ জানে না। মাত্র এইটুকু জানতে পারে ছেলেটি নিখোঁজ!

লোকটি এখন সায়গনে বাস করছে। চোখে মুখে তাঁর একটি দৃঢ়তা, কঠোর শপথের ছাপ। সে বলে, 'আমার পা দুটি ফিরে পেলে আবার আমি সংগ্রাম শুরু করব।'

দক্ষিণ ভিয়েতনামের পীড়নযন্ত্র কেবলমাত্র বিরোধীদলের নেতাদেরই গ্রেপ্তার করে না। যে সব নাগরিকের সমর্থন ও নিরপেক্ষতাকে সায়গণ কর্তৃপক্ষ জয় করতে পারে না, তাদের ওপর নেমে আসে কারাগারের নির্মম নির্যাতন। জনগণকে উচ্ছেদ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নকরণের অস্ত্র হল নির্বাসন। পুলিশ তাদের ভাগ করে বিভিন্নভাবে এবং সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর জনগণের জীবন নির্ভরশীল।

দিয়েমের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট) নীতি অনুসরণ করেন প্রেসিডেন্ট থিউ। থিউ ব্যাপকভাবে পশুর মত জনগণকে যুথবদ্ধ করে রেখেছেন। এই নির্বাসন নির্বিচারে চলে যুদ্ধাঞ্চলে; বিশেষ করে মধ্য ও পূর্ব ভিয়েতনামের প্রদেশ-গুলিতে। কুয়াঙ ত্রি আক্রমণ করে জাতীয় মুক্তিবাহিনী। গ্রামীন কর্মীদের (সংখ্যায় প্রায় ১,৫০০) ডেকে পাঠান হয় 'আলোচনার জন্য'। অফিসে হাজিরার সময়, তাদের গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কন সনে। এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার খবর

56212
11. 4. 77
RS-12.00

ধর্মযাজকদের কানে পৌঁছায়। তারা জানান, এদের অধিকাংশই হল বৃদ্ধ, নারী এবং শিশু। এদের নির্বাসনে পাঠাবার কারণ সম্পূর্ণ অজানা। সরকার থেকে তাদের জানান হয়ঃ এই সব লোকজনের সঙ্গে শত্রুদের যোগাযোগ থাকতে পারে। আজও এরা কনসনে বন্দী।

থুয়া থিয়েন প্রদেশের ১,৫০০ জন অধিবাসী যাদের অধিকাংশই ক্যাথলিক, ১৯৭২ খৃঃ এপ্রিলে কনসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হুয়ের ব্যাপকসংখ্যক বৌদ্ধ, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রকে কন সনে পাঠান হয় কোন বিচার না করেই। একটি চিঠি থেকে প্রকাশ সপ্তাহে ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে পাঠান হয় (মে ১৯৭২ খৃঃ) এইভাবে।

নিখোঁজ মানুষদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা ভয়ঙ্কর শক্ত ব্যাপার। অনুসন্ধানকারী পিতামাতাকে পুলিশ অন্য পুলিশকেন্দ্রে খবর নিতে বলে। সেখান থেকে আবার অন্যত্র। এইভাবেই ক্রমশ ব্যাপারটা হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য ও বেদনাদায়ক।

ব্যাপক গ্রেপ্তারকে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের জন্য ওরা বর্বর নির্যাতন চালায়। এই লোকগুলি হয়ত কোন কারণে অপরাধী, সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে পাঠান হয় এবং "রাজনৈতিক অপরাধ" স্বীকারের জন্য পুলিশ নির্যাতন চালায়। তাদের ওপর জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে স্বীকৃতি আদায় করে পরবর্তী বিচারে তা উপস্থিত করা হয় প্রমাণ হিসাবে। পুলিশ প্রয়োজন মত নির্যাতন চালায়।

প্রাক্তন বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সিডনি স্কানবার্গ লেখেনঃ জেলে থাকার সময় পুলিশের তিক্ত মন্তব্য তারা জানতে পারেন—"যদি তারা নির্দোষও হয়, তাহলেও প্রহার চালাতে হবে অপরাধী পরিণত করতে।"

সায়গন একাকী এই কার্যসূচী চালায় না। মার্কিন লোকজন, যন্ত্রপাতি এবং জিজ্ঞাসাবাদ চালাবার ও নির্যাতনের উপযোগী অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজান হয়েছে সায়গনের সরকারী যন্ত্রকে। বিভিন্ন তথ্যে এবং ভিয়েতনামের জনযুদ্ধের ইতিহাসে এর অজস্র সাক্ষ্য রয়েছে। ১৯৫৫ খৃঃ থেকে মার্কিন এজেন্সি ফর ইণ্টারন্যাশনাল ডেপলপমেণ্ট (এ. আই. ডি,) কার্যসূচী অনুসারে দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় পুলিশ সংগ্রহ, ট্রেনিং ও সংগঠনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। দুইশত পুলিশ বিশেষজ্ঞ পাঠান হয় প্রথম। তারপর দক্ষিণ ভিয়েতনাম 'জন নিরাপত্তা' প্রকল্পে কাজ করতে যায় সাত হাজার মার্কিন নাগরিক। এ. আই, ডি. যে কত টাকা খরচ করেছে তার কোন হিসেব নেই। ১৯৬৮ খৃঃ থেকে ১৯৭১ খৃঃ মধ্যে একটি ব্যয় পরিমাণ ছিল একশত মিলিঅন ডলার। দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুলিশ খাতে মার্কিন ব্যয় প্রধানত সরবরাহ করে সি. আই. এ. প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং এ. আই. ডি। যার ফলে জাতীয় পুলিশের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় এক লক্ষ বিশ হাজার। যা হল বিশ্বের সর্ববৃহৎ আধা সামরিক বাহিনী।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্ত জেলখানাই আমেরিকার তৈরি অথবা তাদের দ্বারা আধুনিকীকৃত। আমেরিকা সরবরাহ করেছে যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতন উপযোগী হাতিয়ার ও মগজ।

প্রায় ৪৫,০০০ হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামীর বিচার হয়েছে, অভিযুক্ত হয়েছে এবং জেলে গেছে রাজনৈতিক কারণে। সম্ভবত এক লক্ষেরও বেশী লোককে গ্রেপ্তার করে, বিনা বিচারে দেশজোড়া বন্দীশিবিরে পাঠান হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপকূল সংলগ্ন কুখ্যাত কন সন কারাগারও আছে। যে পরিমাণ নির্যাতন তাদের ওপর চলেছে, সে অনুপাতে খরচের পরিমাণও

স্বপ্ন। প্যারিস শান্তি চুক্তির পরও এদের ভাগ্য থেকে গেছে অনিশ্চিত।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা ভিয়েতনামী ও মার্কিন কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে প্রায় ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০।

* বন্দীজাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সমর্থকদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে বিবেচনা করা হয় না; এরা হল বেসামরিক বন্দী;

* মার্কিন অর্থসাহায্যে সি. আই. এ. পরিচালিত ফনিক্স কর্মসূচী অনুযায়ী থিউ বিরোধী পক্ষ এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। সেই বীভৎস হামলায়, কেউ জানে না কতজনকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হয়, আর কতজনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল! পরবর্তীকালে সি. আই. এ. এফ-৬ কার্যসূচী চালু করে একই উদ্দেশ্য। যার কর্মকর্তা ৬৩৭ জন মার্কিন নাগরিক।

* দশ হাজারেরও বেশী কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় 'বসন্ত অভিযানে'। তাদের ফু কুয়ক ও কন সন দ্বীপের কারাগারে পাঠান হয়। ১৯৭২ খৃঃ ৯ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট থিউ-এর প্রধান পরামর্শদাতা হোয়াঙ ডাক না স্বীকার করেন যে গত দুই সপ্তাহে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৪০,০০০। তারপর থেকে গ্রেপ্তার চলেছে সমানে।

* অনেকের কখনই বিচার হয়নি (যেমন, ১৯৬৯ খৃঃ কন সনের ৭,০২১ জন বন্দীর মধ্যে ২,৩১৬ জন)। অনেকেই শাস্তিকাল শেষ করা সত্বেও জেলে আটক রয়েছে। যেমন ক্রঙ দিন দুজ। আবার অনেকের শাস্তি সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করা সত্বেও তাদের জেলে পাঠান হয়েছে এবং এখনও তারা জেলে। যেমন, ক্রঙ নগক চাউ।

—১৯৭০ খৃঃ মার্কিন সূত্রে প্রকাশ থিউ-এর কারাগারে বন্দীর সংখ্যা ১০০,০০০ (জুলাই-অগাস্ট কংগ্রেস অধিবেশন ১৯৭১ খৃঃ)।

সুতরাং বর্তমান শাসকের অবৈধ কার্যকলাপ সুস্পষ্ট। সরকারী তথ্যে প্রাপ্ত তথাকথিত 'সংশোধন কেন্দ্রের' ৩৭,৮৭১ জন বন্দীর মধ্যে বেসামরিক বন্দীর শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ এবং সামরিক বন্দীর শতকরা ১০ ভাগকে গ্রেপ্তার করা হয় বৈধ পরোয়ানার সাহায্যে। এমন কি সায়গনের 'সংশোধন কেন্দ্রে' ১৯৬৯ খৃঃ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আটক করা ৪,৬৮৭ এবং ৫,৩৭৬ জন বন্দীর কেবলমাত্র ১৩ থেকে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় আভ্যন্তরীণ মন্ত্রিদপ্তরের অনুমতিতে।

পার্লামেণ্ট সদস্য ত্রান নগক চাউ-এর বিরুদ্ধে দশ বছর সশ্রম দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় ১৯৭০ খৃঃ ৫ মার্চ। পরে সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশ বাতিল করলেও, তাকে জেলে আটক রাখা হয়। বর্তমান দমনমূলক শাসনের অবৈধ কার্যক্রমের এটি একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। একটি বিশিষ্ট ঘটনাও বটে। অগুণন্তি মানুষকে কোন অনুসন্ধান ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সায়গনের প্রাণকেন্দ্রের সংশোধন কেন্দ্র থেকে শুরু করে 'বাঘের খাঁচা', প্রাদেশিক পুলিশ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেলে এবং দূর প্রান্তের কারান্তরালে তারা পচে মরছে সুদীর্ঘকাল।

যদিও বিচার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলে থাকে, তা সত্বেও এটা যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তার প্রমাণ অসংখ্য বেআইনী গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে।

পুলিশ রিপোর্টের চার ভাগের তিন ভাগ বাতিল হয়ে যায় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে। পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা ভঙ্গ করে অবৈধভাবে পুলিশ ব্যক্তিগত বাড়ীগুলিতে তল্লাসী চালায় এবং তাদের হয়রানি করে।

যেসব হতভাগ্য দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার বরণ করে নির্যাতন ও অসদাচরণ পায়, সে ঘটনাও নিঃসন্দেহে বেআইনী।

পুরো শাসনযন্ত্রটাই অমানবিক ও বেআইনী। যদিও শাসন-তন্ত্রের ৭ নম্বর ধারায় চতুর্থ অনুচ্ছেদে আছে: "কাউকে নির্যাতন, ভীতিপ্রদর্শন এবং জোর করে স্বীকৃতি আদায় করা চলবে না" কিন্তু বিচারপতি ত্রান থুক লিন ১৯৭৩ খৃঃ প্রথমেই লেখেন: "আমি নিজের চোখে দেখেছি বন্দীদের বেঞ্চের সঙ্গে বেঁধে তাদের মুখ ও নাকের .মধ্য দিয়ে জল, সাবান জল, নর্দমার ময়লা জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যতক্ষণ তার পেট ফুলে না ওঠে। আমি ছাদ থেকে দড়ি ও লোহার হুক ঝুলতে দেখেছি। যাতে 'বিমান ভ্রমণ' নামক অত্যাচারের শিকার হয় বন্দীরা। আমি রক্তাক্ত বন্দীকে দেখেছি, যে তার থেকেও বেশী রক্তঝরা বন্দীকে বগল দাবা করে চলতে সাহায্য করছে, জিজ্ঞাসাবাদের ঘর থেকে সেল ব্লকে বা কোর্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে পিন, কাঠের রুল, একটি লম্বা ইলেকট্রিক তার বা জলের ট্যাঙ্ক মারাত্মক অত্যাচারের অস্ত্র হয়ে ওঠে রাতের অন্ধকারে। বন্দীর আঙুলের মাথায় পিন ঢুকিয়ে দেয়। কাঠের রুলটি কান, বুক ও পুরুষাঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করে। জলের ট্যাঙ্কটিই সব থেকে বীভৎস। কারণ—এভাবে অত্যাচার বাইরের থেকে মনে হবে কম কষ্টদায়ক। একজনকে কষ্ট করে দীর্ঘ সময় এই দৃশ্য দেখতে হবে না। বন্দীকে জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়। সে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। ট্যাঙ্কের ওপর তখন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে জানিয়ে দেওয়া হয় তার মাথা দেখা যাচ্ছে বাইরের থেকে। প্রশ্নকর্তাদের বেশী সময় নেই, এইসব কাজেব পিছনে পড়ে থাকার। সেজন্য তারা অল্প সময়ের মধ্যে হিংস্র পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। যার ফলে, তারা মদ খাওয়া বা তাস খেলার পক্ষে প্রচু: সময় পায়। সুতরাং তারা এই সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করে: বন্দীকে ট্যাঙ্কে বসিয়ে তার মাথার ওপরকার জলের কলের মুখ খুলে দেয়: যার থেকে বন্দীর

মাথার ওপর জল পড়ে। বন্দীর মনে হবে মাথাটি বুঝি ফেটে যাবে এবং অসম্ভব যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায় অবশেষে।

আকস্মিক ভ্রমণে এসে কোন অফিসার দেখতে পাবে সব কিছুই স্বাভাবিক। জল এবং সাবান রয়েছে বন্দীদের ব্যবহারের জন্যে, ইলেকট্রিক তার হল হীটার জ্বালাবার জন্য। কিন্তু স্বকর্ণে শুনেছি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার এক হৃদয়স্পর্শী শব্দ, শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার তীব্র আর্তনাদ, ভারী কিছু পতনের শব্দ অথবা সিমেন্টের মেঝেতে মানুষের দেহ নিস্প্রাণ হয়ে আসছে।

এই শাসনযন্ত্র অমানবিক। কারণ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১০০ জনের সেলে ৬০০ শত মানুষ রয়েছে। পরিমাণ মত বাঙ্ক না থাকায় বন্দীরা মেঝেতে অথবা কাঠের তক্তার ওপর শুতে বাধ্য হয়। ছাদের কাছাকাছি ওপরের তলাটি হল বেদনাদায়ক কাটা বসান বৈদ্যুতিক তার আটকান।

পায়খানা ছিল যে সংখ্যক মানুষের জন্য নির্দিষ্ট, সেই জনসংখ্যা বেড়েছে দশগুণ। এমন দুর্গন্ধ বেরোয় যে তার মধ্যে ঘুমোতে পারে না বন্দীরা। ছিমিয়ে ঝিমিয়েই কেটে যায়। মশা আর ছারপোকার কামড়ে অথবা পায়খানা যাওয়ার জন্য সহবন্দীদের ঝগড়ায় জেগে ওঠে। একটিমাত্র পায়খানা ৬০০ জনের জন্য। যদি একজন বন্দী তিন মিনিট করে সময় নেয়, তবে সকলের জন্য লাগে ৩০ ঘণ্টা। সেজন্য শেষরাত পর্যন্ত অনেকে বসে থাকে নিজেদের সুযোগ আসবার জন্য। এই অবস্থায় বাস করবার ঘটনাটি কী যথেষ্ট অমানবিক নয়?

ডঃ ত্রান ত্রঙ চাউ ফু কুয়ক দ্বীপের কে তুয়া কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তাঞ্চলে চলে যান। ঐ কারাগারে দেশপ্রেমিক, শান্তিকামী মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর মার্কিন-থিউ চক্রের বর্বর নির্যাতনের কথা প্রকাশ করে দেন।

··জেনারেল পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সেকেণ্ড ব্যুরোতে আমি অমানুষিক নির্যাতন ও প্রহারের সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট দাই আমার দেহের বিভিন্ন অংশে বৈদ্যুতিক শক দিতে থাকে। আমাকে অজ্ঞান করবার জন্য বার বার আঘাত করে। তিন বর্গ মিটারের একটা অন্ধকার ঘরে আমাকে আটক রাখা হয়। তা৲ মধ্যেই খাওয়া দাওয়া ও প্রাকৃতিক কাজকর্ম চলত। বেশী বৃষ্টি হলেই জলে ভেসে যেত ঘর। এ রকম ঘটলে শোয়া বসা ছিল অসম্ভব। দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

তারপর আমাকে পাঠান হয় কে তুয়া কারাগারে। কারাগারের বিমান বন্দরে নামার সংগে সংগে সবুজ পোশাক ও লোহার টুপি পরা সামরিক পুলিশ আমাকে মুগুর ও রাইফেলের বাট দিয়ে পেটাতে থাকে। আমাকে নিয়ে যায় বি-২ নিঃসঙ্গ ওয়ার্ডে। সেকেণ্ড লেফটন্যাণ্ট হিয়েনের নির্দেশে সার্জেন্ট তিন এবং কর্পোরাল দিয়েম আমাকে আঘাত করতে থাকে। আমার জামা কাপড় খুলে নেয়। প্রখর সূর্য কিরণে উত্তপ্ত গরম বালির ওপর পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়তে বাধ্য করে। আমাকে 'আফসার ও বুদ্ধিজীবী বন্দীর' পর্যায়ভুক্ত করা হলেও, পাঁচ মাসের নির্জন শাস্তিভোগ কালে, অন্যান্য বন্দীদের মতই পচা ভাত ও শুকনো মাছ খেয়েছি। সব সময় কষ্ট পেয়েছি জলের তৃষ্ণায়। এই পাঁচ মাসে দাঁত পরিষ্কার বা মুখ ধোয়ার জন্য এক ফোঁটা জল পাইনি। জামাকাপড় অপরিচ্ছন্ন। সেলের মধ্যে দুর্বিসহ দুর্গন্ধ। সারা শরীরে ঘা ভরে যায় এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হই।

অসুস্থতায় পড়লে কোন ওষুধ পেতাম না। গুরুতর অসুস্থ বন্দীরা চিকিৎসার কথা বললে, ওয়ার্ডারা এমন অত্যাচার চালাত যে, অনেকেই প্রাণ হারাত। রাতে গুণ্ডাগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের ওপর মারপিট চালাত। ফলে নার্ভের ওপর সব সময়

তার প্রতিক্রিয়া ঘটত। সব থেকে নৃশংস এবং স্মরণীয় দিন, ১৯৬৮ খৃঃ ২০ ডিসেম্বর; জেলের শয়তান কর্তৃপক্ষ আমাদের খাওয়ার জলে বিষ মিশিয়ে দেয়। ফলে পাকস্থলীতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে বমি শুরু হয়। আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় একজন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারা ভালভাবেই জানত আমি এক সপ্তাহ ধরে কিছুই খাইনি। কিন্তু মেজর কুই এবং লেফটান্যাণ্ট কর্ণেল হিয়েন তাদের লোকজনকে বলে আমার হাত বেঁধে একটি বিছানায় যেন রাতদিন ফেলে রাখা হয়। কেবল ইনজেকশন দেওয়ার সময় ছেড়ে দেওয়া হত। এই হাসপাতালে আমি দেখেছি স্বচক্ষে, মারা যাওয়ার পরও বন্দীদের বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতে শিকের সঙ্গে। ১৯৬৯ খৃঃ এপ্রিলে আমাদের অফিসার ওয়ার্ডের বন্দীদের, অত্যন্ত অমানবিকতার সঙ্গে লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল ফুয়ক এবং মেজর কুই আদেশ দেয় পেরেক লাগান তারের খাঁচায় ঢুকতে। তাদের আদেশ অমান্য করার জন্য, আমিসহ ওয়ার্ডের সমস্ত বন্দীকে টাইফয়েড ও কলেরার ইনজেকশন দিয়ে লোহার পেরেক লাগান তারের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়। সারাদিন ফেলে রাখে রোদে এবং কিছুই খেতে দেয়নি। ফলে অনেকেই জ্ঞান হারায়।

একজন চিকিৎসক হিসাবে মার্কিন থিউ চক্রের দেশপ্রেমিক, শান্তিপ্রিয় ও বুদ্ধিজীবী মানুষের ওপর পশুচিত আচরণে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। বন্দীদের ওপর অত্যাচার ও খুনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দেখতে পাবেন খাদ্য, আলো ও ওষুধের অভাব। আর তা হল সুপরিকল্পিত, ধীরে ধীরে ও যন্ত্রণা দিয়ে দৈহিক ক্ষতি করা এবং তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া।

অতিরিক্ত শ্রম ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মানব দেহের প্রয়োজন প্রতিদিন ১,৪০০ থেকে ১,৬০০ ক্যালোরি, তা সকলেরই জানা। মার্কিন থিউ কারাগারের একমাত্র খাবার হল নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাত

এবং শুকনো মাছ। তা কখনই উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালোরি দিতে পারে না। দরকারী সি. বি. এবং বি-২ ভিটামিনের সম্পূর্ণ অভাব। এরকম খাবার ও ভিজে বাতাসে যে কোন রোগ বীজাণুর সংক্রমণ ঘটা সম্ভব। তাছাড়া সূর্য কিরণের অভাবে বন্দীরা অতি ধীরে ধীরে চলেছে মৃত্যুর দিকে।

কে দুয়া কারাগারের সমাধিক্ষেত্রে ৩,০০০ সমাধি হল মার্কিন-থিউ চক্রের অমানবিক কারা ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মার্কিন আধুনিক 'গুনী বিজ্ঞান' শাস্ত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে নগুয়েন ভন থি ঃ-এর মধ্যযুগীয় বর্বরতা।

কন সন কারাগারের কুখ্যাত কর্ণেল ভে ১৯৭১ খৃঃ চি হোয়া কারাগারে কর্তা হয়ে আসে। এখানে সুপরিকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধ-ভাবে অত্যাচার শুরু করে। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ ২০০ জন ফিল্ড পুলিশ বাঁশের ঢাল, বুলেটপ্রুফ টুপি, পিস্তল, গ্রনেড নিক্ষেপক এবং মুগুর নিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের সেলে হামলা চালায়। সেখানে ৮০ থেকে ১০০ জন বন্দী শোচনীয় অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। হামলাকারীরা বন্দীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেলে। মাসের পর মাস এক জায়গায় কাটিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। নিজেদের গ্রাম ও ঘর সংসার নিয়ে কথা বলত তারা। পরস্পরের নামও ছিল জানা। কর্ণেল ভের পরিকল্পনার ঘৃণ্য দিক এই কৌশলে সুস্পষ্ট। সে ঠিক করে বন্দীদের সরিয়ে ফেলার জন্য আগেই তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে একটি বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরকার। ফলে সহজেই দশজন করে বন্দীকে অন্যত্র সরানো যাবে। রাতের মধ্যেই অনেককেই সরিয়ে ফেলা হয়। অন্যরা তাদের খবর জানবার অবসর পর্যন্ত পেল না। রাজনৈতিক বন্দী এবং ছাত্ররা এক তলার সেলে দেখা পায় পরস্পরের। সেখানে

জাতীয় মুক্তি বাহিনীর ক্যাডাররাও ছিল। তাদের বলা হত ভিয়েত কঙ। সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মিশিয়ে ফেলা হয়। এর কারণ রাজনৈতিক বন্দীদের দলিলপত্রকে সাধারণ অপরাধীদের সংগে মিশিয়ে ফেলা এবং শান্তিচুক্তি সাক্ষরের পর সাধারণ অপরাধীদের মুক্তি না দেওয়ার অজুহাতে এদেরও আটক রাখা।

কর্ণেল ভে বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে। ফলে বন্দী স্বামী, ভাই, বাবা মা বা ছেলের সন্ধান পাওয়ার পথ বন্ধ হয়। যে সব রাজনৈতিক বন্দীর মেয়াদ দু এক বছর আগে শেষ হয়েছে, বলা হয় তাদের শিগ্‌গিরই মুক্তি দেওয়া হবে। বন্দীদের বিদায় জানিয়ে যায় রক্ষীরা। কয়েকদিন পরে তান হিয়েপ এবং থু ডাক কারাগার থেকে আসে কনভয়। যারা মুক্তির কথা ভেবেছিল আজও তারা সেখানেই। সুতরাং মুক্তির অর্থ হল এক জেল থেকে আর এক জেলে যাওয়া! বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাদাম বিনের ভাই নগুয়েন দং হার বেলায় এমনই ঘটেছিল। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করার মত কিছুই ছিল না। তাকে মাদাম-বিনের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। মাত্র তিন বছরে শাস্তিকাল শেষ হওয়ার পর, ভাগনীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার মূলক কাগজে সই দিতে বলা হয় তাকে। টিভিতেও প্রচার করতে বলা হয়। অস্বীকার করলে, তাকে প্রথমে চি হোয়া, পরে কনসনে পাঠান হয়। তারপর কোন খবর নেই!

নগুয়েন দং হার স্ত্রীও ছিলেন জেলে। পুলিশ ওয়ার্ডে তার একটি সন্তান হয়। তাকে বলা হয় ঐ ধরণের কাগজে সই না করলে, তারা বাচ্চাটিকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সে অস্বীকার করে এবং কয়েকদিন পরে শিশুটিকে ওরা নিয়ে যায়।

১৯৭২ খৃঃ অকটোবরে যখন যুদ্ধ বিরতির কথা শোনা যাচ্ছিল,

ঠিক তখনই কর্ণেল ভের এই জাতীয় জঘণ্য কার্যকলাপ শুরু হয়। সব প্রমাণ নষ্ট করার জন্য বন্দীদের মিশিয়ে ফেলে এক ঘৃণ্য মানব-বিদ্বেষী কাজের সে ছিল প্রধান কর্মকর্তা। এইভাবেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনৈতিক বন্দীদের বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়।

ডিসেম্বরের ২০ তারিখ কর্ণেল ভের নির্দেশে ৪০টি শিশুকে দালাতের পুণর্শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান হয়। এদের মধ্যে ছিল তিনটি খুব ছোট মেয়ে, একটি একেবারেই কম বয়সী ছেলে সাউ। সে প্রতি রাতে চেঁচাত সূর্যের আলো দেখবার জন্য। তার কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। কিন্তু সে বা ঐ সব ছেলেমেয়েরা কোথায়?

থিউ সরকারের সম্ভবত এর জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই!

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ১৬ জন ছাত্র অনশন শুরু করে। এদের বেশীর ভাগই ছিল ক্যাথলিক। তারা সূর্যের আলোয় বেরিয়ে যাওয়ার এবং আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি চায়। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে দেখা যায়। পাউলো কনডরের বাঘের খাঁচায় পাঠাবার শেষতম কনভয়ে তাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেল ওজি-৩ (ওয়ার্ড এফ জি)-এ ৫৩ জন রাজনৈতিক বন্দী দীর্ঘকাল পাউলো কনডর কাটিয়ে আসে। চি হোয়ায় তাদের আনা হয় জেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ডলার সংকটের ফলে হাসপাতালে কোন ওষুধপত্র ছিল না, সেবা শুশ্রূষা তো দূরের কথা। কিন্তু ৪০০,০০০ ডলার খরচ করে পাউলো কনডরের ৭ এবং ৮ নম্বর নতুন ক্যাম্পে বাঘের খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। সায়গনের মার্কিন কোম্পানী আর এমকে এর নির্মাতা। ২৬ ডিসেম্বর এদের আবার নিয়ে যাওয়া হয় পাউলো কনডর। এদের বেশির ভাগ পক্ষাঘাত, হাঁপানি, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগে ভুগছিল।

যে অবস্থায় তারা এসেছিল, তার থেকেও শোচনীয় অবস্থায় ফিরে যায়। এইভাবে স্থানান্তর মৃত্যু, শাস্তির মতই সমপর্যায়ভুক্ত।

১২৪ জন অক্ষম বন্দীকে পাউলো কনডর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরা ১৯৭৩ খৃঃ ১৬ ফেব্রুআরি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী কমিশন এবং চারপক্ষের সামরিক কমিশনে চিঠি লিখে ভিয়েতনামী জনগণের শান্তি মুক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সাহায্য কামনা করে:

শান্তি, মুক্তি, নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, দেশের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে, আমরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ লড়াই চালাচ্ছি। সায়গন কর্তৃপক্ষ আমাদের গ্রেপ্তার করে আটক রাখে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন কারাগারে, বিশেষ করে পাউলো কনডরে নির্যাতন চালায়। আমাদের সঙ্গী বন্দীদের অনেকেই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করে। এবং যে ১২৪ জন আমরা বেঁচে আছি, তারা পঙ্গু, অথবা মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত, ক্ষয়রোগ, আন্ত্রিক ক্ষত, যকৃতের যন্ত্রনায় ভুগছি। বর্বর আচরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাখা হয় বাঘের খাঁচায় অথবা গোয়ালে।

কনসনে নতুন তৈরি 'বাঘের খাঁচা' ক্যাম্প-৭ থেকে বিয়েন হোয়ার ৩ নম্বর পুলিশ হেড কোয়ার্টারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ১৬ ফেব্রুআরি ১৯৭৩ খৃ.। তারপর আমাদের চার পাঁচজন করে ছেড়ে দেওয়া হয় বিয়েন হোয়া, ফুয়ক তু, লঙ আন, হাউ নগাই এবং অন্যত্র। আমাদের গৃহে ফেরার ব্যবস্থা না করে, কর্তৃপক্ষ আমাদের তা করতে বাধা দেয়। বিশেষ করে যারা সায়গন চোলোন ও গিয়াদিনের মানুষ। বর্তমানে আমরা আপাত মুক্ত হলেও, আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। সায়গন কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য অবিরত আমাদের শাসানী দেওয়া হয়। সতের বা আঠার বছর ধরে আত্মীয় পরিজন থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা তাদের দেখতে উদগ্রীব। যদিও আমরা এখন পঙ্গু ও দুর্বল, আর আমরা বাড়ী থেকে দূরে নিরানন্দ ও একঘেঁয়ে জীবন কাটাচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট থিউ ঘোষণা করেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই। তার প্রতিবাদে ষাট দিন অনশন করেন মাদাম নগো বা থান। ১৯৭৩ খৃঃ ১০ জুন একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন: "প্যারিস চুক্তি মানা হয় নি। বিশেষ করে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয় নি। তৃতীয় পক্ষ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে থিউ সরকারের রাজনৈতিক বৈষম্যকরণের ঘৃণ্য আইন, পুলিশী নির্যাতন এবং ফ্যাসিস্ত ক্রিয়া-কলাপকে অবশ্যই অভিযুক্ত করতে হবে। একদিকে থিউ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব মানেন না, অথচ তাদের সঙ্গেই প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।"

এই মাদাম নগো বা থান কে?

বিয়াল্লিশ বছরের এই মহিলা একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। তিনি কলম্বিয়া, প্যারিস এবং বার্সেলোনায় লেখাপড়া শেখেন। আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে তার কয়েকটি ডিগ্রীও আছে। সায়গন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর আইনের অধ্যাপনা করেন এবং চারটি ভাষায় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য আইনের বই লেখেন। এই মহিলার বাবা ফম ভন হুয়েন ছিলেন পশু চিকিৎসক এবং দিয়েমের 'দক্ষিণ চল' কর্মসূচীর ডিরেক্টর। সামরিক কর্তাদের বিরোধিতা করার জন্য তাকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়তে হয় এবং তিনি এখন প্যারিসে। সায়গন সরকারের নৌ-অফিসারের মা মাদাম থান, তার বাবার সঙ্গে একদা বহুবার শান্তি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

সায়গনে বাঁচার অধিকার সংক্রান্ত মহিলা আন্দোলনের চেয়ারম্যান মাদাম থান। ১৯৭১ খৃঃ থিউ-এর প্রহসনমূলক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টি দক্ষিণ ভিয়েতনামের এই বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও বক্তৃতাদানের জন্য আহ্বান জানায়। ইয়েল এবং হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ও তাকে অনারারী ডিগ্রি দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

মাদাম থান এখন আটক আছেন সায়গন শাসকদের সব থেকে ঘৃণ্য নির্যাতনের কেন্দ্র বিয়েন হোয়া কারাগারে। তার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার চলেছে। অসুস্থ হয়ে পড়লে কোন ওষুধ দেওয়া হয় না। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত নিষিদ্ধ অথবা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ, তখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে বিচারের জন্য স্ট্রেচারে করে নেওয়া হয় কোর্টে। অভিযোগ, বিচারকদের অসম্মান করা।

এখন তার অসুস্থতা গুরুতর। আঠার কিলোগ্রাম ওজন কমে গেছে। প্রাণের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। দেশে ও বিদেশের ব্যাপকগণ দাবী সত্ত্বেও সায়গন কর্তৃপক্ষ এই মহিলাকে মুক্তি দিতে অসম্মত।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অসংখ্য কারাগারে আটক ২০০,০০০ বন্দীর মতই মাদাম থান এখন আর রাজনৈতিক বন্দী নন। অবশ্য এক সময় মনে করা হত কমিউনিস্ট সমর্থক। সেই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। (ইন্টারন্যাশনাল হেরল্ড ট্রিবিউনের ৩ জুন ১৯৭৩ খৃঃ সংখ্যায় লেখা হয়, থিউ সরকার তার সঙ্গে কমিউনিস্টদের সরাসরি সংযোগের ব্যাপারটি প্রমাণের জন্য তথ্য আবিষ্কারের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়)।

থিউ মনে করেন, মাদান থানকে মুক্তি দিলে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগ দেবেন। তৃতীয় পক্ষে দাঁড় করাবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

বিয়েন হোয়া কারাগারের সি ওয়ার্ডটি হল আঠার বছরের কম বয়স্কদের জন্যে। এদের অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করা হয় ভিয়েত-কঙদের সঙ্গে সংযোগের অজুহাতে।

নেড়া মাথা, চর্মসারদেহ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, ছেড়া কাপড় চোপড় পরা এই সব কম বয়সী ছেলেদের চেনা যায় বহু দূর থেকেও। সত্যিই তাদের জীবন চরম দুর্দশাগ্রস্ত। রেশনের বরাদ্দ হল ২০০ গ্রাম চাল এবং স্বল্প পরিমাণ শুকনো মাছ। এই মাছে কাটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকে না। মুখে সহজেই বি ধে যায় এই সব কাটা। ছোট্ট একটা টিনের পাত্রে দুজনের খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। কয়েক ফোটা জল দেওয়া হয় খাওয়ার এবং ধোবার জন্য। গরমের সময় তাদের প্রায় ছয় মাস স্নান না করেই কাটে। খাওয়ার পর, খাবারের পাত্র বালি ঘসে পরিষ্কার করে। পরের বার খাওয়ার আগে বালি ঝেড়ে ফেলে দেয়।

সারা বছর ধরে কোন কাপড় বা টুপি ওরা পায় না। যদিও বিয়েন হোয়ার ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রতিদিন ওদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। রাতে কখনও পাহারাদারের কাজ অথবা অফিসারদের কোয়ার্টারে চাকরের কাজ করতে হয়। অসুখের সময় কোন ওষুধের ব্যবস্থা নেই! এক মৃত্যুর সময় হয়ে এলে, এক ধরনের ইনজেকশন দেওয়া হয়। তাদের শেষ করতে জেল কর্তৃপক্ষ বেশ কৌশলে 'ভুল ওষুধ' ব্যবহার করে। শাদাপোশাকের এজেন্টরা সব সময়ই নজর রাখে। সামরিক পুলিশের চোখ এড়িয়ে যুব বন্দীরা কখনও যদি কাজ বন্ধ করে কথা বলে, তাহলে এরা গিয়ে তাদের লোহার রড দিয়ে বেদম পেটায়।

এর থেকে গুরুতর অপরাধের শাস্তি হল, নির্জনে আটক রাখা। বহু যুবক পঙ্গু হয়ে গেছে অথবা মারা গেছে নির্মম অত্যাচারে।

যুবকদের নির্জনে আটক রাখার উদ্দেশ্য নানারকম। এভাবে সরিয়ে রেখে পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং সংগ্রাম কিভাবে চলছে সে সম্পর্কেও তাদের চিন্তা-ধারা অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। তাদের তাঁবেদার সরকারের ভাড়াটে কর্মীতে পরিণত করার চেষ্টা চলে। শিশুকাল থেকে খুন গুণ্ডামীর দীক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী অনেকেই। প্রথমেই কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ছড়ান হয়। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে বিকৃত ইতিহাসের জ্ঞানদান। সায়গন ও মার্কিন উচ্ছৃঙ্খলতায় যুবকদের নানাভাবে আকৃষ্ট করা হয়। সহজে অর্থ উপার্জনের উপায় বাৎলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে ছুরি চালাবার কায়দাকানুনে দীক্ষা। অশ্লীল ছবি দেখিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি ঘটাবার চেষ্টা চলে।

এ সব প্রয়াস ব্যর্থ হলে নির্যাতন চলে বয়স্কদের অনুরূপভাবেই।

নগুয়েন হাই থঙকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তার বয়স সতেরও পেরোয়নি। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও সুখী চেহারা দেখে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট নগক বেশ মোলায়েম সুরে বলে: "তোমার মত একটি সুন্দর ছেলে ভিয়েতকঙদের অনুসরণ করছ কেন? তুমি যদি সরকার পক্ষে যোগ দাও তাহলে আমেরিকায় যেতে পারবে লেখাপড়া শিখতে এবং তুমি যা চাও সব পাবে?"

থঙের বাবা মা শত্রুদের হাতে মারা পড়েন। ওদের ওপর তার ঘৃণাও ছিল সে কারণে তীব্র। সে পুলিশটিকে বলল: "তোমাদের দলে টানবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাকে যদি মরতেই হয়, তবে সে মৃত্যু হবে বিপ্লবের জন্য।"

গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। নৃশংসভাবে মারধোর করতে থাকে। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

জ্ঞান ফিরলে ওরা জিজ্ঞাসা করে : ' এখনও তুমি বিপ্লব করতে চাও ?"

সে উত্তর দেয় "হ্যাঁ।"

প্রতিবারই সে সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তিত উত্তর দিতে থাকে। প্রতিবারই তারপর চলে ঘুসি বৃষ্টি।

অন্যান্য অত্যাচারের সঙ্গে, তাকে দুটি স্ক্রু লাগান বার্ডের মাঝে ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হতে থাকে। ঠিক যেভাবে আখের রস বের করা হয়। তখনও সে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়।

শেষকালে খুনীরা ওকে একটি চটের থলির মধ্যে ঢুকিয়ে গরম জল ঢেলে দেয়। খণ্ড জ্ঞান হারায়। তখন তাকে ছুড়ে ফেলা হয় একটি সেলের মধ্যে। জ্ঞান ফিরলে ওরা জিজ্ঞাসা করে: "ও তুমি এখনও বেঁচে আছ! তুমি তাহলে এখন কি করবে ?"

তার উত্তর : "বিপ্লব করব।"

কুয়াঙ নগাই প্রদেশের ডুক থোয় ষোল বছরের ফন থিউকে আপাদ মস্তক শিটিয়ে এনে ঢোকান হয় বাঘের খাঁচায়। দিনের বেলায় সূর্য যখন মধ্য আকাশে—তাপমাত্রা ৩৬ ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তখন তাকে ফেলে রাখা হত রোদে। রাতে একটি বরফের মত ঠাণ্ডা মাটির নীচে সেলে ঢুকিয়ে রাখা হত।

তাকে বলা হত সে তার হাতে 'কমিউনিস্টদের হত্যা কর' লিখবে কিনা! সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বের করে সে বলত, 'এখানে লেখা থাকবে, থিউকে হত্যা কর।"

খুনীরা ঘিরে ফেলে ওকে আঘাত দিতে থাকে নানাভাবে। তাকে ফেলে দেয় মাটিতে। দুজন চেপে ধরে পা আর একজন মাথা। চতুর্থ জন হাতের ওপর লিখে দেয়, "কমিউনিস্টদের হত্যা কর।" সে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে হাতের ওপর লেখাটা

দেখতে পায়। একটা ছুরি দিয়ে হাতের ওপরকার লেখাটা উঠিয়ে ফেলে প্রহরীদের সামনেই।

এর পরিণতি অনুমেয়।

মুক্তিবাহিনীর একজন ডাক্তার লে কুয়ঙ সায়গন থেকে মুক্ত বহু দেশপ্রেমিক সৈনিকের চিকিৎসা করেছেন। এক বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা তিনি জানান সংবাদপত্রে। এই সব বন্দীদের মধ্যে নন হুয়কের মার্কিন ফিল্ড হাসপাতালে বন্দী কমরেড হুঙ তাকে জানান: ওয়ার্ডাররা আমাদের রক্ত বের করে নেয়, আহত আমেরিকান সৈন্যদের জন্য। কুইনন হাসপাতালের সহকারী চিকিৎসক সন এবং দুজন আমেরিকান নার্স আমার শরীর থেকে ১০০ সিসি রক্ত বের করে নেয় পরীক্ষার (!) জন্য। পরের দিন আবার নেয় ১০০ সিসি। পরীক্ষার জন্য ৫ সিসি রক্তই যথেষ্ট। কিন্তু ওরা আমাদের প্রত্যেকের শরীর থেকে থেকে ২০০ থেকে ৩০০ সিসি রক্ত নেয় তাদের লোকদের শরীরে দেওয়ার জন্য।

তাছাড়া শত্রুরা কখনও কখনও আহত বন্দীদের বিকলাঙ্গ করবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটে অন্যায়ভাবে। আঘাত পায় জুঙ। ওর হাঁটুর কাছ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হল। অপরেশনের পর ব্যাপক সংক্রমণে তার জ্বর ও ভয়ঙ্কর বেদনার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়বার তার হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়। আবার সংক্রমণ ঘটে। তৃতীয়বার অপরেশনে বাদ দেওয়া হয় কুচকির কাছ থেকে।

হাতে আঘাত পাওয়া বন্দীদের ঘাড়ের কাছ থেকে কেটে ফেলা হয়। তার ফলে শরীর খাঁড়া রাখা সম্ভব হয়-না এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ডো ভন হাওকে অপরেশন করেন সায়গনের ডাক্তার হিয়েপ। কিন্তু তার পাকস্থলীর মধ্যে কাঁচি থেকে যায়। অপরেশনের কয়েক ঘণ্টা পর হাও-এর পেটে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা শুরু হয়। দ্বিতীয়বার অপরেশন করে সেটি বের করে ফেলা হয়। যখন সে

আরোগ্যের পথে, তখন তৃতীয়বার অপরেশনে তার মলদ্বারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি অন্ত্র কেটে ফেলায় ভগন্দর রোগ সৃষ্টি হয়; মুক্তাঞ্চলের একটি সামরিক হাসপাতালে তার কয়েকটি অন্ত্র-সংযোগের চেষ্টা হলেও, তা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নগুয়েন থি ভিনের চোয়ালে আঘাত লেগেছিল। ওর ব্যাণ্ডেজ খোলার সময় সায়গনের নার্সরা রসিকতা করে তার কান দুটো কেটে দেয়।

ব্যাণ্ডেজ বদলাবার যন্ত্রপাতিও বীজাণুশূন্য করা থাকে না। অপরেশন করা হয় এমন অযত্নে যে, অধিকাংশ আন্ত্রিক ক্ষতের ক্ষেত্রে ভগন্দর রোগ দেখা দেয়। নিজেদের ব্যাণ্ডেজ পরিষ্কার করতে হয় রোগীদের। পরস্পরের ক্ষতও পরিস্কার করতে হয় তাদের।

ডেভিড কিনসে একজন মার্কিন চিকিৎসক। তিনি ছয়মাস মাত্র ছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে। পরে তিনি জানান, যুদ্ধে আহত অসংখ্য মানুষ তাদের হাসপাতালে ভর্তি হত। তার উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা হল:

—একজন অন্তস্বত্বা নারী পেটে গুলির আঘাত নিয়ে আসে।

—একটি বার বছরের ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসে তার আত্মীয়স্বজন। তারা জানায়, আগের দিন তাদের গ্রামে প্রচণ্ড মার্কিন আক্রমণ চালান হয়েছিল।

—একজন পঞ্চাশ বছর বয়স্কা নারীকে 'ভিয়েতকঙ' সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনদিন ধরে পিটুনী চলে তার ওপর। বিদ্যুৎ প্রয়োগে অত্যাচার চালিয়ে এবং অন্যায়ভাবে নির্যাতনে মৃতপ্রায় নারীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

—তিনজন কৃষককে ভিয়েতকঙ সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। নির্মম ভাবে তাদের পেটান হয়। যখন প্রমাণ পাওয়া গেল সত্যিই তারা নির্দোষ, তখন তাদের নিয়ে আসা হল হাসপাতালে।

এই ডাক্তার ভদ্রলোকের বিবরণ থেকে জানা যায়, ত্রিশ হাজার মার্কিন উপদেষ্টা দক্ষিণ ভিয়েতনামে কি ধরনের কাজে লিপ্ত ছিল। এরা ভিয়েতনামীদের শেখায় কি ভাবে মানুষের ওপর নির্যাতন করা যায়। মার্কিন অস্ত্র দেওয়া হয় তাদের স্বজাতির মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে। মার্কিন ডাক্তার স্বীকার করেছেন, এই সব অস্ত্র ভিয়েতনামীদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেনি; শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ, নারী ও শিশুদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র।

বেসামরিক সন্দেহগ্রস্ত নারী বা পুরুষদের ওপর মার্কিনদের বীভৎস অত্যাচারের ধারা ছিল এমন:

—একটি বড় ব্যাগের মধ্যে মানুষটিকে ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর সেই আবদ্ধ ব্যক্তিকে হাতুড়ি বা লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড পেটান হয়, যতক্ষণ না তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। অথচ তার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন থাকে না।

—হাত পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হয় মাটিতে। অত্যাচারীরা তার নাকের মধ্য দিয়ে সাবান জল, চুনের জল, প্রস্রাব, পশুমল প্রভৃতি ঢুকিয়ে দেয়। তারপর পেটের ওপর পা দিয়ে মাড়ান হয় ভয়ঙ্কর ভাবে, যতক্ষণ না ঐ সব অ-পদার্থ জিনিস রক্তসহ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে।

—জলপূর্ণ ট্যাঙ্কের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়। ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় একটি ঢাকনা। ট্যাঙ্কের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত পড়তে থাকায় লোকটি স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান হারায়।

—জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক তার দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গে যুক্ত করা হয়। বিশেষ করে কান, ঠোঁট, স্তনের বোটা, জননেন্দ্রিয়ে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তারের মধ্যে। অবশেষে বন্দী জ্ঞান হারায়।

—সরু বাঁশের মাথা মহিলা বন্দীর যোনিপথে ঢুকিয়ে দেয়।

—হাতের বা পায়ের আঙুলের ডগায় ফুটিয়ে দেয় পিন।

—গাড়ীর পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ী চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে মানুষটির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে।

—অত্যাচারীরা বন্দীর পায়ের পাতা পুড়িয়ে ঝুলিয়ে দেয় অল্প গরম জলের পাত্রে। তার মধ্যে থাকে বড় বড় কেঁচো। ওরা এসে মাংস খায় কু'রে কু'রে। এক তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

—গরম করা লাল পেরেক উরুতে বা পেটের ওপর চেপে ধরা হয়। ঘাড়ে বা পিঠে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

—বড় বড় ছুরি দিয়ে পেট চিরে নাড়ি ভুড়ি বের করে দেয়।

—চামড়ার একটা পটি বেঁধে দেওয়া হয় মাথার চারপাশে। তারপর মানুষটিকে ভীষণ বেগে ঘোরান হয়। ফলে, তার চোখের মণি কোটর থেকে বেরিয়ে এসে ঝুলতে থাকে।

কয়েকজন ভাড়াটে খুনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন মার্ক লেন। তার নোটে আছে :

প্রশ্ন : অত্যাচারের এই সব পদ্ধতি কি তোমাদের সামনে দেখান হয়েছে, না, এ সম্পর্কে কেবল মুখেই বলা হয়েছিল ?

চুক ওনান (নেব্রাসকা) : ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা থাকত। তার মধ্যে দেখান হয় কিভাবে বৈদ্যুতিক তার পুরুষের অণ্ডকোষে বা মেয়েদের শরীরে আটকে দিতে হয়—

প্রশ্ন : কোন অফিসার কি এইসব ছবি ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে দিতেন ?

ওনান : না, ওগুলো ছাপা কপি—

প্রশ্ন : এ ছাড়া অন্য কি দেখান হত ?

ওনান : বাঁশের লাঠি দিয়ে অত্যাচারের নানান পদ্ধতি।

প্রশ্ন : যেমন ?

ওনান : হাতের নখ বা কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন : এই ধরনের কোন পদ্ধতি কি তোমার সামনে কখনও দেখান হয়েছে ?

ওনান : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : নারীদের ওপর অত্যাচারের কি শেখান হত তোমাদের ?

ওনান : আমরা ওদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পা দুটো ছড়িয়ে দেই দুদিকে। তারপর ছুঁচোলা লাঠি বা বেয়নেট ঢুকিয়ে দেই যোনিপথে। তাছাড়া আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল, এদের যতবার খুশি আমরা ধর্ষণ করতে পারি।

প্রশ্ন : কতদিন ধরে তোমাদের শেখান হত ?

ওনান : তা প্রায় ছয় মাসের বেশী। গড়ে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ ঘণ্টার মত।

প্রশ্ন : কলেজে ছয়মাস ধরে তোমার প্রধান বিষয় শিক্ষার থেকেও মনোযোগ বেশী দিতে হত ?

ওনান : তা অবশ্য ঠিক। আমরা অত্যাচারের জন্য তৈরি থাকতাম। সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র কাজ।

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে প্রশ্ন : তুমি কি বন্দীদের হত্যা করতে দেখেছ ?

তেরাতোলা : হ্যাঁ, সব সময় তা ঘটত। আহতদের বাঁচিয়ে রাখার মত সময় আমাদের থাকত না। এইজন্য আমরা তাদের খুন করতাম—এটা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত মনে হয় একটা খেলা।

পাউলো কনডর, ফু লই, থু ডাক, ডার লাক, প্লেকুই, পি ৪২ এসব জায়গাকে এক সময় বলা হত 'পৃথিবীর নরক'। ১৯৫৮ খৃঃ ১ ডিসেম্বর ফু লই-এর ছয় হাজার রাজনৈতিক বন্দীর দেহে বিষক্রিয়া ঘটে। এক হাজার মানুষ মারা যায়, বেঁচে যায় চার হাজার।

ফঙ নাট এবং ফঙ নি বন্দীশালার একশ অধিবাসীকে ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ খৃঃ দক্ষিণ কোরিয়ার ভাড়াটে সৈন্যরা গুলী করে মারে। অন্তঃসত্বা নারীদের বেয়নেটের খোঁচায় হত্যা করে। পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়। জলন্ত বাড়ীর মধ্যে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের ছুঁড়ে ফেলার আগে কেটে দু'টুকরো করে। পাথরের ওপর আছড়ে মারে শিশুদের। ষাট বছরের বৃদ্ধদের মাথা কেটে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

দৈনিক নিউ সায়গন, ১৯৬৩ খৃঃ ১৬ নভেম্বর লেখে পি ৪২ বন্দী শিবিরের লোমহর্ষক কাহিনী। এটি হল সায়গন চিড়িয়াখানার কাছেই। বাঘের খাঁচা সংলগ্ন কারাকক্ষে বন্দীরা অবিরত বাঘের ডাক শুনতে পায়। কোন বন্দীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে একটি গুলিও খরচের দরকার পড়ে না। খাঁচার মাঝখানের ছোট শ্রীলের দরজাটা উঠিয়ে দিলেই ক্ষুধার্ত বাঘ সেই কাজ সারে মুহূর্তে।

যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য গঠিত কমিশনের সূত্র থেকে জানা গেছে সায়গনের চি হোয়া কারাগারের সত্তর জন বন্দীকে হত্যা করা হয়। ফু কুয়ক দ্বীপের কাই দাউ কারাগারের ছয়শত ত্রিশজনবন্দী মারা যায় দৈহিক নির্যাতনে। তাই নিনের কারারক্ষীরা বিস্ফোরক মাইনের সাহায্যে হত্যা করে একশতজন বন্দী।

পাউলো কনডর নরক থেকে ফিরে বিপ্লবী নগুয়েন ডাক থুই একখানি বই লেখেন। বিষাক্ত দ্বীপটির অজানা জীবনধারার বিবরণ আছে বই-এ। ফরাসী আমলে যে কারাগারে থাকত পঞ্চাশ জন বন্দী, এখন সেখানে থাকে দুই শত জন। ক্ষুধার্ত বন্দীরা ঘাস এবং ইঁদুরের মাংস খেতে বাধ্য হয়। দৈনিক জল বরাদ্দ পরিমান জন পিছু ০·২৫ লিটার। শুষ্ক ওষ্ঠকে ভেজাবার জন্য তারা ড্যাম ধরা দেওয়াল চোষে। ব্যাপকভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ায়, বন্দীরা মারা পড়ে মাছির মত।

রাজনৈতিক বন্দীদের মানসিকভারসাম্য নষ্ট করার জন্য অনুসৃত হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। যারা প্রকাশ্যে পার্টির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ অস্বীকার করে অথবা তাঁবেদার বাহিনীর পতাকাকে সম্মান জানায় না, অথবা বিশ্বাসঘাতক সায়গন কর্তৃপক্ষের প্রশস্তি গান করে না—তাদের নিক্ষেপ করা হয় কারাগারে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উষ্ণতা ঝরে মাথার ওপর আর শীতের হিম শীতল জলে ওরা হয়ে পড়ে সংজ্ঞাহীন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্দীশিবির সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিকরা যে সব তথ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন তা এক বর্বর সভ্যতার নিদর্শন। নিউইয়র্ক টাইমের সায়গন সংবাদদাতা সিডনী স্কানবার্গের একটি সংবাদ বেরোয় ১৯৭১ খৃঃ ১৩ অগাষ্ট। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কারাগারগুলিতে কমিউনিস্ট সমর্থক এই অভিযোগে হাজার হাজার বন্দীর ওপর নির্যাতন চালান হয়। কয়েকজন মুক্তবন্দীর মুখে বিবরণ শুনে এবং দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখে স্কানবার্গ মন্তব্য করেন যে, কারাগারগুলির নির্যাতনের নীরব সাক্ষী প্রহরীরা যেসব তথ্য প্রকাশ করেছিল তা অতিরঞ্জিত নয়।

এই সব বন্দীদের দুটি ভাগে রাখা হয়। উত্তর ভিয়েতনামের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং প্রেসিডেন্ট থিউ বিরোধী। বন্দীদের কোন আত্মীয় মুক্তি যোদ্ধা, কেবল এই অপরাধে তাকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। একটি বন্দী শিবিরের প্রহরীর কাছ থেকে জানা গেছে, এক বৃদ্ধার পাঁচ ছেলের চারজন কাজ করে সায়গন বাহিনীতে। একজন কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি-শীল। এই অপরাধে মায়ের জুটেছে কারান্তরালের দুঃসহ জীবন।

প্রহরীদেব ওপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ হল' যদি কেউ নিরাপরাধ থাকে তবে তাকে এমনভাবে পিটাও, যাতে মারের চোটে সে নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে।'

॥ তিন ॥

এক বীভৎসতম বর্বর হামলার মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা নগুয়েন ট্রং তুং, ভো থানা মিন আর লি থানা থুই আমরা এই তিনজন সে কথা তুলে ধরছি দুনিয়ার মানুষের সামনে।

কনসন কারাগারের নোংরা আচরণ আমাদের প্রতিটি দিনকে করেছিল রক্তমাখা। মৃত্যুর কোল থেকে উঠে আসা মানুষের দীর্ঘশ্বাসে দ্বীপপুঞ্জের জীবনে নেমে এসেছিল চিরকালীন নৈঃশব্দ। আজ ত্রিশে জুলাই। উনিশ শত তিয়াত্তর। আমাদের নির্যাতিত দিনগুলির কথা জানাচ্ছি।

পাঁচুই মে ১৯৭৩ খৃঃ।

কনসন কারাগার থেকে একশ সাতজন বন্দীকে কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়ে গেল। তাদের ওপর চলল বীভৎস মারধর। তারপর তাদের সই করতে বলা হল মুক্তিপত্রে। ঐসব মুক্তিপত্রে তাদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি এবং গোপন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। বন্দীদের কয়েকজন এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৃশংসভাবে মারধর করা হয়। তারপর বন্দীদের পাঠান হয় চি হোয়া (সায়গন) কারাগারের প্রেক্ষাগৃহে। একশ সাতজন রাজনৈতিক বন্দীর জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে।

মে মাসের আট থেকে চব্বিশ তারিখের মধ্যে এই সব বন্দীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে পাঠিয়ে দেয় বিভিন্ন পুলিশ বিভাগে। তিন থেকে পাঁচজনের এক একটি দলকে সায়গন শহরে ছড়িয়ে দেয় ওরা। পুলিশ ও গোপন পুলিশের হাতে মারা পড়ে তাদের বেশীর ভাগ। বাকিরা কোথায় তা অবশ্য পরেও জানা যায় নি।—

দাং ভন হুং নাম, কিয়েও কঙের নগুয়েন ভন তু, সাইগনের ত্রিউ কং তিন—এরাও ছিল একশত সাতজন নারী ও পুরুষ বন্দীদের মধ্যে। তারা যে কোথায় হারিয়ে গেছে সে খবর কেউ জানে না। বাঘের খাঁচায় সাত নম্বর ক্যাম্পের জি, এইচ, জে, বি এবং ডি-র কমপক্ষে একশত বিরাশিজন বন্দী কয়েক বছর ধরে (তিন থেকে পাঁচ বছর) চলশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৩ খৃঃ ফেব্রুআরির ষোল তারিখে কারাগার কর্তৃপক্ষ ওদের একত্র করে। স্ট্রেচারে করে তোলা হয় সি ১৩০ কার্গো বিমানে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় বিয়েন হোয়া জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে। নাম বোর বিভিন্ন স্থানে তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ গোপনে নজর রাখে তাদের ওপর। মাইথো শহরের পাগোদা ওং-এর চোদ্দজন বন্দীর একজন পরে (১৯৭৩ খৃঃ ২৪ ফেব্রুআরি) জানায়ঃ হু নগিআ, ট্রানভন হিয়েপ (গিয়াদিন) কং ট্রান নগোকে হোয়াং (লং আন)-এ যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের পরে আবার গ্রেপ্তার করে কোথাও পাঠান হয়। কিন্তু কোথায় তা কেউ জানে না।

চোদ্দজনই জানিয়েছিল ফেব্রুআরির চোদ্দ এবং পনের তারিখে সি-১২৩৮-বিমানে চারবার যাত্রায় বহু অসুস্থ বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় কন দাও থেকে। এর মধ্যে সাত নম্বর ক্যাম্পের পয়তাল্লিশ জন খোঁড়া হয়ে যাওয়া মানুষও ছিল। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় দুই নম্বর ট্যাকটিকাল জোনে। তারপর তাদের খবর-- নিরুদ্দেশ।

এরা আরও জানিয়েছে—বাঘার খাঁচা থেকে চলে আসার সময় ওরা কুড়িজনকে সেখানে দেখে এসেছিল। নিয়মিত হামলায় ওদের চলা ফেরার ক্ষমতা লোপ পায়। দুখানি হাত দিয়ে দেহটাকে সামান্য নাড়াচাড়া করতে পারত মাত্র। ওদের ওপর যে নৃশংস নির্যাতন চালান হয়েছিল তার কোন তুলনা নেই।

সায়গন কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কনদাও কারাগারের প্রধান নিযুক্ত

করে ছ দ ও ভন ফু-এর পরিবর্তে নগুয়েন ভন ভে-কে। ফু-র থেকেও জঘণ্য ব্যক্তি ভে। তিয়াত্তরের আঠাশে এপ্রিল থেকে পাঁচই মের মধ্যে সে ব্যক্তিগতভাবে একদল ভাড়াটে গুণ্ডা ও খুনী পুলিশ নিয়ে জঘন্য হামলা চালিয়েছিল। ছয় নম্বর ক্যাম্পের বি সেকটরে এক, দুই, তিন এবং চার নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় তিনশত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে শয়তানেরা। ওরা ভিতরে ঢুকে বন্দীদের মুগুরপেটা করে। প্রায় হাজার গজ দূরে গেট পর্যন্ত নিয়ে যায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে। সাতজন মারা যান। পয়ষট্টি বছরের কুক, কিয়েন ফঙের হো কি তুঙ, কুয়াঙ নামের নগুয়েন লোই, কামাঘ-এর ছিন-এরা ছিল নিহতের তালিকায়। গুরুতর আহত হয় তিন শত সত্তর জন।

ঠিক এক সপ্তাহ আগে নগুয়েন ভনভে ব্যাঙ্গের সঙ্গে তার সাকরেদদের বলেছিল: 'ভিয়েতনাম সম্পর্কে সাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি বিষয়ে সরকারীভাবে তোমাদের কিছু জানান হয় নি। এর খবর মাত্র তোমরা জেনেছ এবং এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। সেজন্য প্রেসিডেন্ট থিউ-এর সরকার তোমাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পার। তোমরা জান জানুআরি মাসের একুশ তারিখে তিনি ঘোষণা করেন, সবকিছু আগেকার মতই চলবে। তার নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। নির্যাতন, জিজ্ঞাসাবাদ এবং অন্তরীন চলবেই। সরকার মনে করলে তোমাদের জীবন নিয়ে নেবে।'

তিয়াত্তরের জানুআরির আঠাশ থেকে সাতই এপ্রিলের মধ্যে পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে তিনবার হামলা ঘটে। একসপ্তাহ ধরে ক্যাম্পের প্রধান দানের নেতৃত্বে এই নির্যাতন চলেছিল। ভাড়াটে গুণ্ডারা ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করে দেয়। ফাঁক দিয়ে চুন, মল ও নোংরা ছুড়ে ফেলে ওয়ার্ডে। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে বহু বন্দী জ্ঞান হারায়। মার্চের

পঁচিশ তারিখে সুপারিনটেনডেন্ট কয়েকজনকে পিঁটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। এপ্রিলের সাত তারিখ নগুয়েন মগন মারের চোটে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে যায়। পাঁচজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

মার্চের প্রথমে আট নম্বর ক্যাম্পের বন্দীদের কয়েকজনকে স্বতন্ত্র করণের ব্যবস্থা করে জেল সুপারিনটেনডেন্ট। হুয়ন হু দাইকে সারা রাস্তায় প্রচণ্ড মারধর করা হয় হাঙ ডুয়ঙ থেকে আট নম্বর ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনার সময়। এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা আজও অজানা।

এপ্রিলের চৌদ্দ থেকে ছ'ই মের মধ্যে তিন সপ্তাহে জেল কর্তৃপক্ষ পিটিয়ে মেরে ফেলে চোদ্দজন রাজনৈতিক বন্দীকে। আহতের সংখ্যা পাঁচশয়ের বেশী।

একমাত্র আট নম্বর ক্যাম্প থেকে জানুআরির আঠাশ থেকে এপ্রিলের চব্বিশের মধ্যে ওরা তিনশত বন্দীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। ক্যাম্প চার, ছয়-এ, ছয়-বি ও সাতের পাঁচ হাজার বন্দীকে আর ফিরিয়ে আনে নি। ক্যাম্প এক, দুই, তিন এবং পাঁচের বিরাট সংখ্যক বন্দী যাদের নাম তালিকায় নেই, তারা নিরুদ্দেশ! জুনের শেষে আরও আশিজন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় কনটুমে যাদের অনেকেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হাজার হাজার বন্দীকে কঠোর শ্রমে আটক করা হয়েছে। উইস্ট উইণ্ড, সম্রাট কুয়াঙ ট্রুঙের বিশ্রামাবাস, কাঠকয়লার কারখানা, ইটখোলা, ঘড়ি তৈরীর কারখানা এসব নানান জায়গায় ওরা দিনের পর দিন কাজ করে চলেছে। এখানে রয়েছে ভাড়াটে, খুনী গুণ্ডা। বন্দীদের কঠোর শ্রম করিয়ে নিয়েও ওরা অতৃপ্ত! যে কোন লোককে যখন খুশি পেটাতে পারে। যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোন কাজও করতে পারে না। তাদের গুলি করে মারা হয়।

দুই থেকে দশজনের বন্দীদলকে ওরা রান্না, কাপড় কাচা, জেলের পরিচালক—অফিসার প্রহরীদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে বাধ্য করায়। ওরা বিনা পরিশ্রমে যে কাজ করে তার বিনিময়ে পায় জঘন্য আচরণ। ডিরেক্টর ইউয়ার পর থেকে তা আরও বেড়েছে।

বন্দীদের দৈনিক বরাদ্দ খাবার চুরি করে ওয়ার্ডেনরা। ঘড়ি, কলম, কাপড় চোপড় কিছুই থাকে না। এমন কি মেয়েদের অন্তর্বাসের ওপরও ওদের লোভ প্রবল। বন্দীদের আত্মীয়স্বজনরা যেসব প্যাকেট পাঠায়, তাও ওয়ার্ডেনরা আত্মসাৎ করে।

বেসামরিক ব্যক্তিদের (রাজনৈতিক বন্দীদের) সাধারণ অপরাধীর মত রাখা হয়েছে দু নম্বর ক্যাম্পের এগার নম্বর ওয়ার্ডে; ভূতপূর্ব লেবার ইয়ুথ সংস্থার সদস্য এবং সায়গন ছাত্ররা আছে আট নম্বর ওয়ার্ডে, ক্যাম্পের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে, ক্যাম্প সতের নিঃসঙ্গ শাস্তিদানের কেন্দ্র বাঘের খাঁচায় রয়েছে অত্যাচারের নানান উপকরণ। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিককে কন দাও-এ বার থেকে আঠার বছরের মেয়াদে আটক রাখা হয়েছে বিনা বিচারে। ছয় নম্বর ক্যাম্পের সেকটর বি-তে বর্বরতা সীমাহীন। তাদের প্রাণ ঝুঁলছে সুতোয়। অনেকেই অদৃশ্য হয়েছে।

অঘটিত এবং অশ্রুতপূর্ব বর্বরতার মধ্যে কনডর-এর বন্দীরা দিন কাটাচ্ছে। রক্তাক্ত নৃশংসতায় ব্যাপক গণহত্যা চলছে। নতুন নতুন বন্দী আসছে। প্রতিদিনে ওদের নির্যাতন কুৎসিত হয়ে উঠছে।

এই অবস্থায় আমাদের দেশের সৎ দেশপ্রেমিক, স্বাধীন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও শান্তিকামী সন্তানদের বর্বরতা ও নিশ্চিহ্নকরণের হাত থেকে বাঁচাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ওপরে ঘটনা আর একবার প্রমাণ করে, এর প্রতিকার প্রতিরোধ দরকার ছিল আরও আগেই। তাহলে আমাদের পিতৃভূমির বহু সন্তান প্রাণে বাঁচত।

প্রতিদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত শাসনের নানা দুর্নীতিপূর্ণ অপশাসন ও বর্বরতম অমানবিক আচরণের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষকে উদ্বেগাকুল করছে। ঘটনার পর ঘটনা, অত্যাচার আর দস্যুতার বিভীষিকাময় আলেখ্য।

কুখ্যাত থিউ সরকারের কনসন (পাওলো কনডর) কারাগারে মারা গেছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা, নিরীহ মানুষ। প্যারিস চুক্তির পরেও এখানে বর্বরভাবে হত্যা করা হয়েছে রাজনৈতিক বন্দীদের। তাদের দৈহিক শক্তি অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। ওপরের কাহিনীটির ছাড়াও ১৯৭৩ খৃঃ সাতই জুলাই এখানকার বন্দীদের একটি পত্রে আছে ঃ

বন্দীদের ফেরত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং হত্যার জন্য কনসন কারাগার কর্তৃপক্ষ উনত্রিশে এপ্রিল থেকে ছ'ই মের মধ্যে সব বন্দীদের একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। তাদের ফটো তোলা হয়। আগে থেকে তৈরি করা আবেদন পত্রে তাদের সাক্ষর দিতে বলা হয়। রাজনৈতিক বন্দীরা কর্তৃপক্ষের এই অন্যায় নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এক নম্বর ক্যাম্পের এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ডে, ছয় নম্বর ক্যাম্পের এক, দুই ও তিন নম্বর ওয়ার্ডে এবং তিন, চার পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের প্রায় সব ওয়ার্ডেই কাঁদানে গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করা হয়। আমরা জ্ঞান হারাই। তখন এক কোম্পানি পুলিশ ও কয়েকশ খুনী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লোক ওয়ার্ডে ঢুকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে আমাদের বর্বরভাবে পিটাতে থাকে। জ্ঞান হারান মেয়েদের বিবস্ত্র করা হয়। বন্দীদের যৎসামান্য জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা লুট করে নেয়। এই সরাসরি বর্বর অত্যাচার চালান হয়েছিল দ্বীপের গভর্ণর ভে এবং ডেপুটি গভর্ণর চিন খুয়ঙের নির্দেশ। বন্দীদের ওপর অত্যাচার চালাবার ব্যাপারে তারা কুখ্যাত। সংবাদপত্র ও জনগণ তাদের বিরুদ্ধে

বহুবার ধিক্কার জানিয়েছে। এই অপরাধমূলক নির্যাতন চালাতে নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান চু ফুক্ এবং কারাগারের উপ-প্রধান হাই হুই অংশ নেয়।

সায়গনের খুনীদের কাহিনী ধর্মযাজকরা তুলে ধরেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে। একারণে ধর্মযাজকদের নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ডেট্রিয়টের বিশপ টমাস জে, পামবেলটন দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছিলেন ইস্টার সপ্তাহে। সায়গনে বন্দী ও তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার বিবরণ ন্যাশনাল ক্যাথলিক রিপোর্টে 'জেল্‌স্ হোল্‌ড পলিটিক্যাল প্রিজনার' প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (১১ মে, ১৯৭২ খৃঃ) ঃ

আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, সায়গনের এবং দেশের সমস্ত প্রদেশের কারাগারে রয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক বন্দী।

কোন অপরাধ করে তারা জেলে যায় নি। তাদের একমাত্র অপরাধ বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক বিরোধিতা। প্রমাণ আছে। এটাও পরিষ্কার এই সব বন্দী সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘস্থায়ী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এসব জিনিস হাল্কাভাবে বলছি না।

সম্প্রতি ছাড়া পাওয়া কয়েকজন বন্দী যুবকের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমি কখনও ভুলব না। খৃস্টান যুব কর্মীদের তিনজন সদস্যের সঙ্গে একদিন আমাদের দেখা হয়। ছোট একটা ঘরে আমরা ছিলাম। সেখানে তাদের দুজন এল। তারা এখনও যথেষ্ট বিধ্বস্ত হয়ে আছে। তাদের একজন সামান্য কিছুটা হাঁটতে পারে। তা আবার খুবই আস্তে আস্তে। তারপর এল তৃতীয়জন। তার ঘরে ঢোকার সেই মুহূর্ত আমি জীবনে কখনও ভুলব না। কি বলব, তা আমাদের খেয়াল ছিল না। সে হাঁটতে পারছিল না। খুব ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছিল প্রায় উবু হয়ে। মুখখানা

যন্ত্রণাকাতর। অতি বেদনার দৃশ্য। যুবক বন্দী হওয়ার আগে ছিল স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম। এখন সে কোন ক্রমে নড়তে পারে! এই তিনজনের কেউই দুষ্কর্মের জন্য অভিযুক্ত হয় নি। তা সত্ত্বেও তাদের আটক করে রাখা হয়েছিল এবং নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতিত হয়। তাদের কোন বিচার পর্যন্ত হয় নি। সরকারী নির্দেশ অমান্যের জন্য তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। আর এই আইনের মানেই হল প্রেসিডেন্ট যা খুশি তাই করতে পারেন।...

এ থেকেও মর্মান্তিক, অ-বিস্মরণযোগ্য এবং দুঃসহ ঘটনা আরও বহু আছে। সায়গন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ডাক হোয়া গ্রামে আমরা চারজন রাজনৈতিক বন্দীর দেখা পাই। সম্প্রতি তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ হাঁটতে পারে না। একজন বাঘের খাঁচায় কাটিয়েছে ছয় বছর। বেশীর ভাগ সময় লোহার রড দিয়ে তার হাতে ও পায়ে আঘাত করা হত। দেহের ওপরে আঘাতের ফলে ওদের প্রত্যেকেই আভ্যন্তরীণ অসুখে ভুগছে।

গ্রামের মানুষ অভুক্ত থেকে থেকে, ক্রমশ চলেছে মৃত্যুর পথে। হীনতম দরিদ্র এরা। মুক্তির পর এখনও এরা অমানবিক অবস্থায় বাস করছে।

এদের মধ্যে যখন ঘুরছিলাম, তখন একজন মুক্তবন্দীও ছিল আমাদের সঙ্গে। স্থানীয় গোপন পুলিশ লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ থেকে বোঝা গেল, ওদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এ সম্পর্কে তারা বেশ সচেতন হলেও, আমাদের সঙ্গে মিশতে ওদের আগ্রহ ছিল অদম্য। তাছাড়া, ওদের সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষকে সচেতন করতে আমরা যাতে সচেষ্ট হই, সেই আশা ছিল প্রবল।

আমরা আর একটি গ্রামে যাই। সেখানকার মানুষের মুখে প্রতিশোধ গ্রহণের আতঙ্ক ছিল বেশ স্পষ্ট। এই গ্রামের পাঁচজন মানুষের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চেয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে দেখা

হলে, লক্ষ্য করলাম গ্রামের সমস্ত মানুষই কেমন ভেঙে পড়েছে। ওরা আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেও ছিল অনিচ্ছুক। এদের তিনজন লোককে আবার ধরে নিয়ে গেছে গোপনে জানতে পারলাম। অপর দুজন কোথাও লুকিয়ে আছে। লোকজন আমাদের জানাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন সেখান থেকে সরে পড়ি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের ভয় ও সম্পূর্ণ অসহায়তা আমার মনে গভীর নাড়া দিয়ে গেল।

তারপর বিশপ তুলে ধরেছেন, সেইসব মানুষের কথা, যাদের প্রিয়জনেরা রয়েছে কারাগারে। তিনি লিখছেন ঃ

পরদিন আমি সেইসব বাড়ীতে গেলাম, যেখানে স্ত্রী, মাতাপিতা ভাই, বোন, প্রিয়জনেরা অপেক্ষা করছে, চরমবেদনায় দিন কাটাচ্ছে তাদের আপনজনকে জেলখানায় রেখে। আমরা প্রথমে যে বাড়ী কয়েকটিতে গিয়েছিলাম, সেখানকার পাঁচজন যুব খৃষ্টান কমাদলের নেতাকে এপ্রিলের ত্রিশ থেকে পয়লা মের (১৯৭২ খৃঃ) রাতে ঠিক এক বছর আগে আটক করা হয়। তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা হয়। কোন অপরাধেই তারা বিচারের সম্মুখীন হয় নি বা অভিযুক্তও হয় নি। সরকারের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনে যোগদানই ছিল সম্ভবত তাদের অপরাধ।

তারপর বিশপ লিখেছেন ঃ

অন্য এক সময়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক বন্দীদের অন্যতম মাদাম নগো বা থনা-র পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের ফরাসী, স্প্যানিস এবং ইংরেজী ভাষায় কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যাপক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডক্টরেট এবং নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক আইনশাস্ত্রে, এম, এ।

তাঁর স্বামী এবং উনিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে কোন খবর জানতে পারেন নি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় পর্যন্ত, তিনি ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাননি। তিনি জানান, এত দুর্বল যে কোন কিছুই দেখতে পান না, তিনি হাসপাতালে রয়েছেন। অথচ কোথায় তা তাকে জানায় নি।

প্রেসিডেন্ট থিউ সম্প্রতি বিদেশ ভ্রমণকালে যা বলেছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র ধর্ম যাজকের, বন্দীদের এবং বন্দীদের আত্মীয়দের বক্তব্যে স্পষ্ট। তিনি রোমে পোপ পল এবং সাংবাদিকদের জানান ভিয়েতনামে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই। বহুস্থানেই তিনি একথা বলেছেন।

কিন্তু যুব খৃষ্টান কর্মীদের পিতামাতার কাছ থেকে যে সব তথ্য আমি পেয়েছি, তা থেকে বোঝা যায় সরকার তাদের সন্তানদের রাজনৈতিক বন্দী শ্রেণীবদ্ধ করেছে। বন্দীদের জেলখানায় দেখা করার সময় সরকারী ভাবে তাদের কাছে এই বক্তব্য জানান হয়।

আমি জানতে পারি বন্দীদের রাজনৈতিক শ্রেণীকরণ মুছে ফেলার চেষ্টা করছে সরকার। রাজনৈতিক বন্দীদের নিশ্চিহ্ন করার কাজ সরকার চালাচ্ছে সে অভিযোগও আমরা পেয়েছি। বন্দীরা আমাকে জানিয়েছে অভিযুক্ত অপরাধীদের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে অন্যদের সঙ্গে আলাদা করেই রাখা হত।

আমেরিকা ভ্রমণের সময় প্রেসিডেন্ট থিউ জানান সরকারী কারাগারে কিছুই লুকিয়ে রাখার নেই। জনসমক্ষে তিনি বলেন, জেলখানা দেখতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তিকেই তিনি অ্যাপ্যায়িত করবেন।

আমি সেই সব মানুষের আবেদন ভুলব না, বিশেষ করে যেসব

বন্দীদের পরিবার ও বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল—তাদের ওপর কি ঘটছে তা সকলকে জানাতে হবে। তাদের একমাত্র আশা, বহু মানুষ এ সব জানতে পারলে, একটি ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হবে সকলের পক্ষ থেকে। এই সব মানুষের ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতার জন্যে অসংখ্য সম্মিলিত প্রয়াসের দরকার।

বিশপের এই কাহিনী আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সৃষ্টি করে ব্যাপক আলোড়ন। মানুষের শত্রু মানুষ, মানুষের ওপর মানুষ পশুর থেকেও যে হীনতম আচরণ করতে পারে বিশ শতকের ইতিহাসে রয়েছে তার অফুরন্ত প্রমাণ। ভিয়েতনামের রক্তমাখা ইতিহাস ধর্মযাজকেরাই সব থেকে বেশী উদ্ঘাটন করেছেন। এখানে আর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

কে দুয়া জেলে পাঁচ মাস আটক থাকার পর ডঃ ট্রাং ট্রং চিকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি প্রায় মুমূর্ষু। পাঁচ দিন না খেয়ে কেটেছে। মেজর ন্যুয়ে এবং লেফন্যাণ্ট কর্ণেল হিয়ে আদেশ দেন তাঁর পায়ে বেড়ি পরাবার। তার চারপাশের বন্দীরা মরে পড়েছিল বেড়ী বাঁধা অবস্থায়। বিশে ডিসেম্বর, (১৯৬৮ খৃঃ) জাতীয় মুক্তি বাহিনী বার্ষিকীতে খুনীরা ওদের পানীয় জল দূষিত করে দেয়। মানে, এক হাজার বন্দী মারাত্মকভাবে বিষের শিকার হয়।

চিকিৎসার সুযোগের কথা ভাবতে গিয়ে ওদের মধ্যে আরও আতঙ্ক দেখা দেয়। কয়েকজন অসুস্থ বন্দী জানায় তারা কখনও হাসপাতালে যাবে না, কারণ সেখানে সাদা পোষাক পরা পুলিশ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

বিন দিনের আট চল্লিশ বয়স্ক ট্রান থান বন্দী ছিল ডি-নম্বর ওয়ার্ডে। হাই ব্লাডপ্রেসারে সে ছিল শয্যাগত। তাছাড়া ফুসফুসের অসুখ ছিল মারাত্মক। চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে, তার বুকে

মুগুর দিয়ে আঘাত করা হয়। সে প্রাণ হারায়! লঙ আনের তেত্রিশ বছরের ফন ভন এইচ ছিল ওয়ার্ড সি চারে। তার গ্যাসটিক ট্রাবেলের কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রচণ্ড লাথি মারা হয়।

রোগীরা জানতে পারে, সাম্প্রতিক চিকিৎসার অভিনব ব্যবস্থা হল, রোগস্থানে আঘাত করা।

বিশেষ কারাগারের সেকেণ্ড সেকটরের চীফ কর্পোরাল নূ জানায়ঃ. কেবল মৃত মানুষেরাই তাদের সেল থেকে বেরোতে পারে। সজ্ঞানে কেউ বাইরে গেছে জানতে পারলে ওয়ার্ডের সমস্ত বন্দীকে শাস্তি দেওয়া হয়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য, সে মৃত দেহগুলিতে লাঠি দিয়ে খোচা দিয়ে থাকে।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডে কোন জেল অফিসার থাকে না। কেবল প্রহরীরা থাকে রোগীদের ধোকা দেওয়ার জন্য। অসুস্থ বন্দীরা সেখানে অপেক্ষা করে সারারাত, অথবা আরো বেশী সময় চিকিৎসার সুযোগের জন্য। এর মধ্যে অবশ্য মারা যায় অনেকেই।

আটষট্টির জুন মাসে কুয়াং নগাই থেকে নগুয়েন এইচকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বয়স আটচল্লিশ। সায়গনের জেলে দুমাস ধরে তার ওপর চলে নির্যাতন। অগাস্ট মাসে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ফু কুয়াকে। তখন সে একটি জীবন্ত কঙ্কাল মাত্র। হাটতে গেলেও সঙ্গীর দরকার হয়। হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কোমরে এমন লাথি মারা সুরু হয় যে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। উনসত্তরের প্রথম থেকে তার রক্ত বমি শুরু হয়। তার মনে হয়, আত্মীয় পরিজনদের মুখ আর দেখা হবে না। সব সময় শুয়ে থাকে সে। ওঠবার ক্ষমতা নেই। পা দু'খানা ঝুলে আছে কাঠির মত।

ফু কুয়ক দ্বীপ থেকে ছাড়া পাওয়া পঁচিশ জন অসুস্থ বন্দীর সাত জন হাই ব্লাডপ্রেসার. তিন জনের ফুসফুস, হাড় এবং চামড়ায় যক্ষা,

ছয় জনের নেফরাইটিস অর্থাৎ মূত্রগ্রন্থিতে যন্ত্রণা এবং আস্ট্রিও-মাইলিটিস অর্থাৎ পুষ্টির অভাবে হাড় শুকিয়ে বা বেঁকে যায়। এখন তারা সযত্ন চিকিৎসাধীন মুক্তাঞ্চলে।

চৌত্রিশ বছরের হোয়াং ভনের ডান হাত নষ্ট হয়ে গেছে। দুটো পাই প্যারালিসিস। সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন। শিরদাড়ায় আঘাতের ফলে সে গুরুতর অসুস্থ। দীর্ঘদিন পাথুরি রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তিন বছর ধরে ক্রমাগত জ্বরে ভুগছিল। কিন্তু হাসপাতালেই তাকে ভর্তি করা হয় নি। অত্যাচারে তার দেহের অবস্থা এমন হয় যে প্রস্রাবের জন্য টিউব ব্যবহারের দরকার হয়ে পড়ে।

ফু কুয়কের বিশেষ বন্দীদের প্রতি আচরণ নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন। বন্দীনিবাসটি দুই, চার, পাঁচ ও ছয়—এই কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রতিটি কাঠের ব্যারাক নয় মিটার লম্বা, তিন মিটার চওড়া। কখনও ত্রিপল দিয়ে ঢাকা থাকে। বিমান-বন্দরে ব্যবহৃত লোহার পাত বিছান থাকে মেঝেতে। অমসৃণ দিকটা থাকে ওপর দিকে। সাতাশ বর্গ মিটারের ছোট জায়গায় থাকে একশ থেকে ষাটজন বন্দী। কখনও একশ চোরাশিজনও থাকে। এই নরকে তিন বছর কাটাতে বাধ্য হয় নিন থুয়ানের চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক নগুয়েন ভি এবং লং আনের ফম ভি এইচ।

বন্দীদের কখনও চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে শেখান হয় তাদের। দুদিনের মধ্যেই তাদের পায়ের অবস্থা হয় করুণ। শেষ পর্যন্ত ভাগ করা হয়: দাঁড়ান, বসা এবং শোয়া। তিন ঘণ্টা বাদে বাদে তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে নিতে পারে। যে শুয়ে থাকে সে পা উঠিয়ে দেয় যে বসে আছে তার ঘাড়ে এবং মাথা তুলে দেয় কারো পায়ের ওপর। এদের বেশীর ভাগই সাধারণত স্বাভাবিক থাকে

না এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা বাধ্য হয়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দেয়। আর ফুটোর মধ্য দিয়ে তাদের মাথা বেঁধে দেওয়া হয় শক্ত করে।

মলমূত্র জমে ব্যারাকটি পরিণত হয় নরকে। বারবার প্রতিবাদ জানান সত্বেও প্যানগুলি বদলে দেওয়া হয় তিন মাস বাদে বাদে। বন্দীরা পূতিগন্ধময় পোকামাকড়ে ভর্তি নরকে বাস করে।

জেলখানার একমাত্র খাবার শুকনো মাছ। কোন সব্জীর ব্যবস্থা নেই। বন্দীরা ঘাস খেতে বাধ্য হয়। জলের সরবরাহ ভয়ঙ্কর কম। প্রতিটি বন্দীকে দিনে আধপাত্র মাত্র জল দেওয়া হয়। খুব প্রয়োজন না হলে তারা জল ব্যবহার করে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া স্বপ্নের ব্যাপার। প্রচণ্ড রকম আমাশয়ে ভোগে বন্দীরা।

দাং সি পায়জামা পরত। কিন্তু গিট বাঁধতে পারত না। কারণ সে মারাত্মক চর্মরোগে ভুগছিল। মহিষের গায়ের মত তার চামড়াও কালো এবং মোটা হয়ে যায়।

বন্দীদের প্রত্যেককেই দৈহিক শ্রমের কাজে বাধ্য করা হয়। অসুস্থ বন্দীরা রেহাই পায় না। জল টেনে আনা, আবর্জনার স্তূপ সরান, জমিতে মাটি কোপান, কাঠ কাটা এসব শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয় তাদের। শেষের কাজটাই হল বর্বরতার চরম নিদর্শন। জেলাররা গাছ কাটার যে সময় সীমা ঠিক করে দেয়, তার মধ্যেই গাছটি মাটিতে ফেলতে হবে। তিনশ মিটার ব্যাসের একটি গাছ কাটার সময় মাত্র পাঁচ মিনিট। সম্ভব না হলে চাবুকের প্রহার চলে। যার ফলে অনেক সময় মৃত্যু ঘটে!

লেফটন্যান্ট এইচ বলে: শোন, ফু কুয়কে তুমি আমার শাসনে। আমার ইচ্ছার অধীন তোমার জীবন। তোমার মৃত্যু মানে একটি ডেথ সার্টিফিকেট। সুতরাং বুদ্ধিমানের মত চল।

॥ চার ॥

আমাদের চোখ বাঁধা, পিছনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁধা হয়েছে দুটি হাত। ওরা আমাদের ফেলে দিল মাটির ওপর। একটা হোৎকা মত পুলিশ, তার সমস্ত শরীর জুড়ে মদের গন্ধ ভুর ভুর করছিল। ও আমাদের ওপর বর্ষার মত ঘুষি চালাল। হাঁটু, পায়ের তলা, মাথা, ঘাড়, বুক, পিঠ, উদর কিছুই বাদ পড়ল না। ও আমাদের খিস্তি দিতে থাকে যাচ্ছে তাই ভাবে। আমরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে কাজ করছিলাম, তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জোর দিতে থাকে।

অস্বীকার করায়, অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পেটাতে থাকে। দু'ঘণ্টা পিটুনির পর আমাদের হাটু পিঠ আর ঘাড়ের কিছুই ছিল না। উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। মাথা ফেটে রক্ত মেখে আমাদের মুখগুলো হয়েছিল শয়তানের মত দেখতে। এই ভাবে মার খেয়ে খেয়ে মানুষের পক্ষে বাকি দিনগুলো হামাগুড়ি দিয়ে কাটান ছাড়া আর উপায় থাকে না। থু ডাকে এই ঘটনা ঘটত অবিরত আর এখনও ঘটছে। সাহিত্যের ছাত্রী কুয়েলনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখ্য। ও এখন বন্দী আছে পাউলো কনডর। ওর দুটো পাই অক্ষম হয়ে গেছে। কিম লিয়েনের একটা পা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, ক্রাচ নিয়ে হাটে।

যে মেয়ের পায়ের পাতার নীচে আঘাত করা হত, তারা পক্ষাঘাতে ভুগছে, আর তাদের সন্তান ধারণ ক্ষমতাও বিনষ্ট। তাদের অনেককে এইভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ভাবে মারধর করার চিহ্ন কিন্তু পরে তাদের

শরীরের কোথাও চোখে পড়ে না। আমরা যখন সায়গন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ছিলাম তখন শুনেছিলাম তিনটি মেয়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু একই সেলে না থাকায়, আমরা তাদের নাম জানতে পারি নি।

ক্যাম্পে এবং বন্দীশালায় মৃত্যু প্রাত্যহিক ঘটনা। মৃত দেহগুলি নষ্ট করে ফেলে পুলিশ অথবা জেল কর্তৃপক্ষ। এমন কি এ সম্পর্কে মৃত মানুষদের পরিবারগুলি কোন খবর পর্যন্ত পায় না।

বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে দেওয়া হয় দেহের স্পর্শকাতর অংশে। বিশেষ করে, জরায়ু মুখে, স্তনের বোটায়, বগলে, জিভে। বিদ্যুতের আঘাতে ক্রমশঃ মেয়েদের সন্তানধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। জেলে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায়, সে একসময় বন্ধ্যা হয়ে যায়। মেয়েদের বেশীর ভাগই ভোগে জরায়ু সংক্রান্ত ব্যাধিতে।

বৈদ্যুতিক নির্যাতনে মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় মৃগীরোগ। সমস্ত শরীরে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড কাঁপুনি, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোয় এবং যতক্ষণ জ্ঞান না হারায় যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। থু ডাকে পুলিশ যে পর্যায় এসি বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবহার করে তার পরিণতি সব থেকে মারাত্মক। রাতে বন্দীদের আর্ত চীৎকারে হৃদয় ফেটে যায়। কিন্তু ওয়ার্ডেনরা কুৎসিত গালিগালাজ করতে থাকে। ওদের কাছে এটা হল জেলখানায় 'শান্তিভঙ্গের' ঘটনা।

বন্দীকে প্রচুর পরিমাণ জল খাইয়ে দেওয়া হয় জোর করে। তারপর হৃষ্টপুষ্ট পুলিশ সেই জল বের করে দেওয়ার জন্য তার পেটের ওপর উঠে লাফাতে থাকে বুট জুতো পায়ে। নিঃসন্দেহে এটা অমানবিক কাজের অঙ্গ। এই নির্যাতনের শিকার হয়ে ট্রু অঙ থি কিম লিয়েনের পাকস্থলীতে জন্ম নেয় দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা। সে ভাত খেতে পারে না। বমি করে ফেলে। মাসিক হচ্ছে যে সব মেয়ের অথবা যারা অন্তঃস্বত্বা তারাও বাদ পড়ে নি।

নির্যাতনে তারা ভোগে রক্তস্রাবে অথবা গর্ভপাত ঘটে। ট্রু অঙ থি কিম লিয়েনের একটানা দু মাস রক্তপাত ঘটে। সঙ্গীদের যত্নে সে সেরে ওঠে কোন মতে। আমাদের দেশের অন্য কোন জেলখানায় এত মানুষ গর্ভপাতের শিকার হয়নি, এখানকার মত।

বন্দীদের হাত পিছনে বেঁধে দেওয়া হয় শক্ত করে। তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ছাদ থেকে। জ্ঞান না হারাবার আগে পর্যন্ত পুলিশ তাকে পেটাতে থাকে। ১৯৭০ খৃঃ ৫ মার্চ রাতে, সায়গনের পুলিশ ষ্টেশনের ফার্স্ট কোয়ার্টারে আঠার বছরের ছাত্রী টু নগা-র ওপর এইভাবে নির্যাতন চলে। বহুবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

নারী বন্দীদের ওপর অন্য ধরনের অত্যাচারও করা হয়ে থাকে। আঙুলের মাথায় পিন ঢুকিয়ে দেওয়া; কাঁচি বা সাড়াসি দিয়ে কেটে নেওয়া হয় মাংস, দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে দেওয়া হয় মাথা; পিঠে মুগুর দিয়ে পেটান হয়।

চী হোয়ার মহিলা ওয়ার্ডের হাই-কে পনের বছরের কঠোর শ্রম দণ্ড দেওয়া হয়। পুলিশ তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল এবং সে উঠে দাঁড়াতেও পারত না। এ রকম একটি অক্ষম নারীর ওপর যে সরকার এই ধরনের কঠোর দণ্ড দিতে পারে, তাকে কি দেশপ্রেমিক বা মানবতাবাদী বলা চলে?

বন্দীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করবার পর, তার স্তনের বোঁটায় সূঁচ ফুটিয়ে দেয়, যোনীপথে ঢুকিয়ে দেয় বোতল, দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গ বগল, কুঁচকি, উরুদেশ অথবা ঘাড় পুড়িয়ে দেয়।—

প্রতিটি থানা অথবা কারাগারে ধর্ষণ একটা সাধারণ ব্যাপার। দলবদ্ধ বলাৎকারের শিকার হয়ে অনেক মেয়েই অসুস্থ হয় পড়ে অথবা মারা যায়।

নগুয়েন থি রিয়েঙের হাত দুটো লিয়েনের কাপড় জড়িয়ে, পেট্রোলে ভিজিয়ে, আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেয়।

বন্দী অবস্থায় বিশেষ করে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মেয়েরা মলমূত্রাদির ব্যাপারে ভয়ঙ্কর অসুবিধায় পড়ে। পোশাক বদল করতে পারে না। সাবান পায় না। পরিষ্কার হওয়ার মত জল তো দূরের কথা। এটা সব থেকে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে মাসিকের সময় অথবা কোন মেয়ে অসুখে যখন আক্রান্ত হয়।

কোন মেয়েকে বন্দী করার সময় পুলিশ তার সন্তানদেরও সঙ্গে নিয়ে যায়। থানায় পৌঁছাবার পর, তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের সরিয়ে ফেলা হয়। তাদের পাঠান হয় অনাথাশ্রমে। কিম লিয়নের দু বছরের বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়। দু মাস বাদে সে যখন জামিনে ছাড়া পেল, তখন দেখা গেল তার সন্তানের শরীরে আছে কেবল হাড় আর চামড়া। কাঁদবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। এমনকি পায়ে ভর দিয়েও দাঁড়াতে পারে না। থু ডাকে দু'বছরের জন্য আটক করা হয় ট্রান থি হানকে। তার চারটি সন্তানের কোন খবরই সে পায় নি। জেল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও সঠিক উত্তর মেলে নি। এক শিফটের লোক অন্যদের গালি দিয়ে সরে পড়ে। ট্রাঙ বমের একজন মহিলা দু বছরের জন্য আটক রয়েছেন। তিনি তার দুটি সন্তানের কোন খবরই জানেন না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সব থেকে বড় মহিলা কারাগার হল থু ডাক। এটিকে বলা হয়ে থাকে 'পুর্নশিক্ষা কেন্দ্র'। এখানকার কদাচারের অভিজ্ঞতা ঘটেছে যে সব বন্দীর তাদের ভাষায় বলা যায় পৃথিবীর নরক এটা।

এখানে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মহিলাকে আটক রাখা যায়। দুটি ভাগ আছে বন্দীদের—সাধারণ বন্দী এবং রাজনৈতিক বন্দী। কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাস নীতির ওপর নির্ভর করে বন্দীদের সংখ্যা।

সাধারণ বন্দীদের (চুরি, বিশ্বাসভঙ্গ, খুন) শাস্তি জীবন কিছুটা

সহজ। তারা খাদ্য ও দরকারী জিনিস কিনতে যেতে পারে, অথবা চলাফেরা করতে পারে। তারা অফিসগার্ল হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক বন্দীদের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে যাওয়ার সময় পাহারা দেয়। কিন্তু স্বৈরাচারী কারারক্ষীদের হাতে রাজনৈতিক বন্দীদের জীবন দুর্বিসহ।

১৯৭০ খৃঃ ১৫ এপ্রিলের আগে প্রতিজনের দৈনিক রেশন বরাদ্দ ছিল ২৯ পিয়েষ্ট্রা। চাউল ও জ্বালানী কমিয়ে দেওয়ার পর দু বারের খাদ্যের জন্য তার পরিমাণ হয় চার থেকে পাঁচ পিয়েষ্ট্রা। যখন আমরা থু ডাক জেলে ছিলাম, তখন গুজব শুনেছিলাম, সরকার 'কৃচ্ছ্রসাধন উদ্দেশ্যে' এই পরিমাণও কমিয়ে দেবে। বিশেষ করে বর্ষাকালে কারাকক্ষগুলি ভয়ঙ্কর সেঁতসেঁতে। বন্দীরা মাসের পর মাস ভিজে মেঝেতেই ঘুমায়। ঘরগুলি ছোট এবং নতুন মেয়ের দলকে পুনর্শিক্ষার জন্য আনা হলে ঘরগুলি হয়ে পড়ে জনভারাক্রান্ত। গর্ত আর সরু পথে শুয়ে থাকতে হয় বন্দীদের। অসুস্থদের সঙ্গে থাকে সুস্থরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নীচু ছাদের করোগেটেড টিনের অসহ্য উত্তাপ। যার ফলে ভিজে মেঝে থেকে ওঠে সে তসেঁতে বাষ্প। খাবার ও ওষুধের অভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি।

নির্যাতন ও জঘন্য জীবনধারার ফলে ব্যাধি বন্দীশালায় বিপর্যয় ডেকে আনে। কিন্তু ওষুধ দুষ্প্রাপ্য। জটিল অসুখে কখনও কখনও মাথা ধরা, সর্দি কাশি, পেটে ব্যাথার ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। থু ডাকে মিঃ কানের তখনও কিছুটা হৃদয় ছিল। তার কাছ থেকে জেনেছি ওষুধের অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমান সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী রাজত্বের নীতি অনুসারে সেসব দেওয়া হয় না অসুস্থ মানুষদের। হাসপাতালে যাওয়া বা ডাক্তার দেখাবার অনুমতি দেয় একজন নার্স। সে আবার মানবতা বোধের দ্বারা পরিচালিত হয় না। নীচতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার সে। গুরুতর

অসুস্থরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে, সেখানে পায় তিরস্কার ও গালিগালাজ। তারা একমাত্র আশা করতে পারে, যে কোন রোগেই একটা বেদনানাশক ইনজেকশন মাত্র।

জেল কর্তৃপক্ষ রোগীদের অসুখকে কর্তব্য এড়াবার ভান বলে মনে করে। যখন তারা অসুস্থ হয়ে কথাবার্তা বলতে পারে না, তখনই তাদের প্রকৃত অসুস্থ বিবেচনা করা হয়। ভাগ্যক্রমে স্থান হয় হাসপাতালে।

থু ডাক কারাগারের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডু অঙ নগক মিনের নির্দেশেই ঘটে এসব। সে হল খুনী শ্রেষ্ঠ। সত্যি কথা বলতে তারা বন্দীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। ১৯৬৯ খৃঃ অগাস্টে একজন পিটিয়ে মারা বন্দীর দেহ দাবী করে অন্যরা আন্দোলন শুরু করলে ডু অঙ নগক মিন নির্যাতন চালাবার আদেশ দেয়। আরও চারজন বন্দী মারা পড়ে। সেলের মধ্যে চুন ও ডিডিটি পাউডার স্প্রে করে।

তিনশ বন্দীকে পাঠান হয় পাওলো কনডরে।*

নিয়মকানুনও চরম বর্বর। মেয়ে বন্দীরা গান করতে পারে না। একই ঘরের অন্য বন্দীদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। অসুস্থ হলেও তাদের নিয়মিত কাজ করে যেতে হয়। বেগার খাটতে হয় তাদের। এমনকি যাজকরা এলে তাদের স্বাগত জানাতে বাধ্য। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা এবং ভিয়েতনামের ইতিহাস পড়তে দেওয়া হয় না। জেল কর্তৃপক্ষ মানবতার নিদর্শন হিসাবে একটি সাহিত্য শিক্ষাক্রম চালু রেখেছে। কিন্তু তারা ইতিহাস পড়ায় না! ওদের ভয় হল, ভিয়েতনামী বীরাঙ্গনাদের আদর্শে বন্দী মেয়েরা অনুপ্রাণিত হতে পারে। জেল কর্তৃপক্ষ ঘরে ঢুকলেই বন্দীদের উঠে দাঁড়াতে হয় এমনই নির্দেশ। প্রতিদিন

---

*এই দ্বীপে একমাত্র পুরুষদের বন্দী করা হত। এই ঘটনার পর প্রথম নারী বন্দীদের পাঠান হয়।

দুবার পতাকা অভিবাদন করতে বাধ্য। ভিন্ন ধর্মাচারী হওয়া সত্ত্বেও প্রোটেস্টান্ট উপদেশাবলী শুনতে হয়। পূর্ণশিক্ষা কেন্দ্রের নিয়মাবলী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে কঠোর ভাবে! এসব না মানলে শাস্তি দেওয়া হয় নৃশংস। হাতে পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় সংকীর্ণ, অন্ধকার, নোংরা সেলে শুয়ে কাটাতে হয় মাসের পর মাস। তাদের পরিষ্কার হতে দেওয়া হয় না, এমনকি দর্শন প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ।

বন্দীদের মধ্যে ডুঅঙ নগক মিন একটি গুপ্তচর চক্রকে মিশিয়ে দেয়। তারা বন্দীদের কথাবার্তা শোনে এবং তাদের কাজের ধারা জেনে নিয়ে নিরাপত্তা কমিটিতে রিপোর্ট করে। গুপ্তচরেরা যাদের পছন্দ করে না তাদের ইচ্ছামত ক্ষতি করে থাকে।

থু ডাক কারাগারে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কার্যত তা জেল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মেটায়। আর এই ভাবেই বন্দীদের শ্রম ধ্বংস করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ অথবা হাতে চালান সেলাই কলে তারা যেসব পোশাক তৈরি করে তা বিক্রি হয় অকল্পনীয় সস্তায়। মার্কিন সৈনিকের একটি পোশাকের জন্য দেওয়া হয় পাঁচ পিয়েষ্ট্রা। একটি মশারীর দাম মাত্র দুই পিয়েষ্ট্রা। সূচি শিল্প বিভাগ কারা কর্তৃপক্ষ যে মাল সরবরাহ করে তা প্রদর্শনীতে যায় এবং রপ্তানী হয়! সুদক্ষকারিকররা পরিচালক বা ওয়ার্ডেনের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে খাটে। যে সব বন্দীর আত্মীয়রা দূরে থাকে এবং তাদের দেখা পায় না তারা নিজেদের খরচ চালাবার অর্থের জন্য কঠোর শ্রম দেয়। যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোন কাজ করতে পারে না, তাদের নাম তখন তালিকায় ওঠে। তৃতীয় বার কাজে অনুপস্থিতির পর তাদের শৃঙ্খলা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

কঠোর নিয়মকানুনের ফলে নিরাপত্তা রক্ষী ও শৃঙ্খলা রক্ষীদের কৃপায় রাজনৈতিক বন্দীরা নানাধরণের শাস্তি পায়। যারা 'বারো

গায়ের আইন ভাঙে' অথবা খারাপ আচরণ করে তাদের বন্দীজীবন অনির্দিষ্টকাল বেড়ে যেতে থাকে। ষাট বছরের একজন মহিলা জেলে তার নির্দিষ্ট সময় কাটাবার পর জানতে পারে তাঁকে আরও ছয় মাস আটক থাকতে হবে খারাপ আচরণের জন্য। তার অপরাধ সে একটি পোশাকে সূচের কাজ করে বাড়ীতে পাঠিয়েছিল। ১৯৫৯ খৃঃ একজন মহিলার এক বছর জেল হয়। ১৯৭০ খৃঃ এপ্রিল পর্যন্ত তার মুক্তি ঘটেনি। তার অপরাধ, সে বেশী খাদ্য চেয়েছিল, বেগার খাটার বিরোধিতা করে এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মসভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। থু ডাকের কোন মহিলা বন্দী সময় মত ছাড়া পায় না। তাকে অন্তত ছয়মাস বেশী জেলে কাটাতে হয়। যারা কেবল সাময়িক শাস্তি পায় অথবা আদালতে হাজির করা হয়েছিল, তারা কখনই মুক্তি পায় না, যতই বয়স্ক বা অসুস্থ হোক না কেন!

অভিযোগ প্রমাণপত্র উপস্থিতের ব্যাপারে নিরাপত্তা বিভাগ এবং সামরিক ট্রাইব্যুনলের শম্বুকগতির বিষয়ে আমরা কিছু উল্লেখ করছি। গ্রেপ্তারের সময় থেকে বিচার আরম্ভ পর্যন্ত কোন মহিলা-বন্দীকে কমপক্ষে বারো মাস জেলে কাটাতে হয়। বিচার উপস্থিত করার সময় আইন প্রয়োগকারীরা বন্দীর আহত স্থান ও অসুস্থতাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে! দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিচার সভায় উপস্থিত করার আগেই তাদের ওপর যে বর্বর হামলা চালান হয়েছিল, তা মুছে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে ওরা।

[সায়গনের চারজন ছাত্রী—ট্রঅঙ্ থি কিম লিয়েন, ডো থি টু নগা, কাও থি কুয়ে হু অঙ এবং ট্রু অঙ হোঙ লিয়েনের উপরোক্ত রিপোর্টটি ১৯৭০ খৃঃ ৪ জুলাই সায়গন টিচার্স কলেজে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন বন্দীদের সভায় প্রদত্ত বিবৃতি।

কুয়েনানের ফু থাই কারাগারে ১৯৬৮ খৃঃ থেকে মহিলা বন্দীদের আটক করা হতে থাকে। সরকারী কাগজপত্র এদের ভিয়েত কঙ যুদ্ধবন্দী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কারাগারে প্রবেশের পর তাদের ওপর সুরু হয় বর্বরতম অত্যাচার। পিটিয়ে তাদের গর্ভপাত ঘটান হয়, বন্ধ্যা করে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কোন রকম বিপ্লবী কাজের পক্ষে অক্ষম করে দেওয়া হয় তাদের। সায়গন শাসকদের পতাকাকে অভিবাদন না জানালে, পুতুল সরকারের প্রশংসাসূচক গান না গাইলে, অশ্লীল চলচ্চিত্র দেখতে অস্বীকৃতি জানালে, কারারক্ষীদের সম্মান না দেখালে,—যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় আঘাত পড়তে পারে।

জেল সুপারভাইজার লককে সম্মান জানাতে অস্বীকৃত হওয়ায় শ্রীমতী নগুয়েন থি খানকে পরিণত করা হয় একটি আবর্জনার স্তূপে। অস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যায় অফিস ঘরে। মহিলার দেহের নরম অংশে তারা পেরেক পোতা জুতো দিয়ে লাথি মারে, পেট মাড়িয়ে দেয় বারবার। যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর মোচড়াতে থাকে। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে লক একখানি খসখসে লাঠি ঢুকিয়ে দেয় শ্রীমতী খানের যোনি পথে। এক গাদা রক্তের মধ্যে সে জ্ঞান হারায়। চুল ধরে টানতে টানতে তাকে নেওয়া হয় সেলে। যে সব মেয়ে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাদের মাথায় ও পিঠের ওপর গিয়ে পড়ে লাঠির আঘাত।

শ্রীমতী নগন সুপারভাইজার মিন ও কুয়েকে অভিবাদন না জানালে, কুয়ে তার পা দুটি ধরে মাথাটা নিচের দিকে দেয় ঝুলিয়ে। নীচে তরল ডিডিটিতে ডুবে গিয়ে তার মাথার চুল উঠে যায়, মুখ ওঠে ফুলে। দৃষ্টিশক্তি ভীষণ হ্রাস পায়।

একটি অনশন ধর্মঘটের নায়ক হিসাবে শ্রীমতী ফম থি কা-কে

সন্দেহ করা হয়। মেজর হাউ-এর গুণ্ডা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। সে হাসপাতালে চিকিৎসার সময় কেবলমাত্র পেয়েছিল একটুকরো তুলো। তাকে পরিষ্কার করার মত জল ছিল না ক্যাম্পে। সমস্ত ক্ষত মুখগুলো ছিল হা করে। নাক ভেঙে যায়। দৃষ্টি শক্তি কমে যায় তার। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ায় তার খাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়।

সায়গন প্রশাসকদের পতাকা ও কর্তাদের সম্মান না জানাবার জন্য ফু থাই-এর প্রায় সমস্ত নারীবন্দীদের বীভৎস ভাবে পেটান হত জ্ঞান না হারান পর্যন্ত। তাদের মুখে লেপে দেওয়া হয়েছিল রঙ। পায়খানা যাওয়ার পথে অনেকেই পড়ে যায়। তখন তাদের চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয় রঙ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ১৯৭১ খৃঃ সেপ্টেম্বরে জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের কবিতা লিখতে বাধ্য করে। যারা গররাজী হয় তাদের চাবুক এবং লোহা ও রথারের তৈরী মুগুর দিয়ে বেদম পেটান হয়, যতক্ষণ না জ্ঞান হারায়। তাদের জল এবং ভাত বন্ধ হয়। কয়েকজন জল খাওয়ার জন্য কুপের মুখ খোলে। তাদের পেটাতে থাকে মিলিটারি পুলিশ। এদের তিনজন হোয়া, ট্র অঙ এবং মিনকে কুপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। ক্যাম্প জুড়ে প্রতিবাদের পর ওদের উঠিয়ে আনা হয় কুপ থেকে।

তারপর এক সপ্তাহ থেকে এগার বার দিন পর্যন্ত জল এবং খাবার দেওয়া হয় নি। অনেকে নিজেদের প্রস্রাব পান করে তৃষ্ণা মেটায়। কিন্তু যখন প্রস্রাবে তৃষ্ণা মেটাতে পারে না, তখন তারা নিজেদের ঘাম চাটতে থাকে।

রাতে কারারক্ষীরা পাহারায় বেরোয়। সামান্য নড়াচড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ। মশার কামড় খেয়েও নড়বার উপায় নেই। দেখতে

পেলেই ওদের হাতে নির্দয় প্রহার অথবা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে যায়।

বিন দিন প্রদেশের ফু মাই জেলার শ্রীমতী নগুয়েন থি বে দাঁতের ঘায়ে ভুগছিল মারাত্মক ভাবে। সে ঘুমোতে পারত না। অবিরত গোঙাত যন্ত্রণায়। মুখটা চেপে রাখত হাত দিয়ে। তাকে ধরে নিয়ে রক্তবমি না করা পর্যন্ত অত্যাচার চালান হয়ে। সেলের মধ্যে যখন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল, তখন সে প্রায় মৃত। সঙ্গীরা দেখল, ওর সমস্ত শরীরে কালশিরার দাগ। দেহটা ক্ষত বিক্ষত। সবাই মিলে ওকে ধরে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। শ্রীমতী বে মারা যায়।

নির্লজ্জভাবে অমানবিক উপায়ে যাবতীয় অত্যাচার চালায় কারারক্ষীরা। ভাতের মধ্যে পোকা মিশিয়ে দেয়। বন্দীদের শোবার জায়গায় কাদা ছড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে মেশান থাকে কাটা।

ষাট সত্তর বছরের বৃদ্ধারাও নির্যাতন থেকে রেহাই পায় না। চাউ ডক প্রদেশের বৃদ্ধা হো থি চিনকে পিটিয়ে প্রচণ্ড রোদে ফেলে রাখে। সমস্ত শরীর রোদে পুড়ে ঝলসে উঠে ফোসকা পড়ে, তারপর তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বিশেষ সেলে।

পুনরুদ্ধারকরণ প্রহসনের প্রতিবাদ জানান বা ফুঙ। তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। পেটে চলে লাথি বর্ষণ। হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও যখন তার ছিল না তখন তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় দশ দিনের জন্য বাঘের খাঁচায়। ক্যাম্প জুড়ে অনশন ধর্মঘটের জন্য তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সেলে।

বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে প্রচুর ঘাস জমে যায়। সেই ঘাস উঠাতে আদেশ দেওয়া হয় নগু এন থি আনকে। অস্বীকার করায় তার দেহের দুটি পাশই আসাড় হয়ে যায় চিরদিনের মত।

সত্তর বছরের ডু ক্যাম্পের সব থেকে বয়সী। সব ধরনের অত্যাচারের শিকার সে হয়েছে। বহুবার বাঘের খাচায়'ও তার আশ্রয় ঘটে। মারাত্মক ভাবে দুর্বল শরীরে বাত রোগে এমন অবশ হয়ে পড়ে যে, তার হাটবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেতে থাকে।

'বিমান যাত্রা' 'সাবমেরিন যাত্রা' দেহের স্পর্শকাতর অঙ্গে বৈদ্যুতিক শক ছাড়াও মহিলাবন্দীদের ওপর যাবতীয় অমানবিক আচরণ করা হয়ে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের সমস্ত পোষাক খুলে ফেলা হয়। নানারকম অশালীন আচরণ চলে। তারপর চলে একের পর এক ধর্ষণ। পিছনে হাত বেঁধে যোনীপথে সাপ বা পাকাল মাছ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

হোআ নন জেলার হোয়া হো গ্রামের আঠাশ বছরের নগুএন থি সুঅনকে গ্রেপ্তারের ঠিক পরেই দশজন আমেরিকান মিলে ধর্ষণ করে। তীব্র ক্রোধ ও যন্ত্রণায় সে উন্মাদ হয়ে যায়। সব সময় সে আমেরিকানদের গালি পাড়ে। কারাগারের সবাই তাকে ঘৃণা করে। এই মেয়েটি অসুস্থ হলে, তাকে সঙ্গীরা নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। মেডিকেল অফিসার ট্রান ভিন হোয়া ওপরওয়ালার নির্দেশ মত দেহে বিষ ইনজেকশন করলে মেয়েটি মারা যায়। এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানাতে থাকে সমস্ত মেয়ে বন্দী। প্রথমে ওরা অপরাধ অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকায়, ওরা বলে চিকিৎসায় ভুল হয়েছে।

চোদ্দ বছরের মেয়ে হুয়েন থি নগ-কে পিটিয়ে অজ্ঞান করার পর দশজন আমেরিকান মিলে ধর্ষণ করে। তার নড়াচড়া করার ক্ষমতা ছিল না।

এর থেকেও জঘন্য কাজ করে টাইগার ডিভিশনের একদল দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য। শ্রীমতী লঙ তাদের ধর্ষণের ফলে মারা

যায়। ওর যোনিপথে একটি লাঠি ঢুকিয়ে দেয় সৈন্যরা। জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে মেয়েদের বলাৎকার করবার জন্য কুকুরকে ট্রেনিং দেয় জেল কমাণ্ডার। ষোল বছরের নগুয়েন থি নি এই অত্যাচারের শিকার হয়। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সে শয়তানদের গালি পাড়তে থাকে। তখন তাকে বলা হয়ঃ কেবল তুমি নও, যে অবাধ্য হয় এবং আমাদের কাজে বাধা দেয় তাদের ওপর এই রকম আচরণই করা হয়।

ফুয়ঙ নগু এন

[দক্ষিণ ভিয়েতনাম]

ফু তাই কারাগারের মেয়েরা কেবল বর্বরতার শিকার হয়নি। একদিন জেলে থাকা, হাজার দিন বাইরে কাটবার মত। সুতরাং পড়াশুনায় ওদের ব্যস্ত হতে হয়েছে। মুক্ত হওয়ার পর বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পেই এই জ্ঞানচর্চা। একটি শিক্ষাক্রমও চলু করা হয় জেলের মধ্যে।

ক্লাস জেলখানার বাইরের মতই অতি সাধারণ। শিক্ষক ও ছাত্র দুইই ছিল। যাদের শিক্ষা একটু বেশী অর্থাৎ সপ্তম বা ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত পড়েছে তারাই শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেয়। ঘরের মেঝে হল শিক্ষকের টেবিল, আর ব্ল্যাক বোর্ড ও কপি বুক। একদল পড়াশুনা করবার সময় অন্যরা সতর্ক হয়ে থাকে। সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক সব বিষয়েই পড়ান হয়। ইতিহাস ও সাহিত্য, অতীতের গৌরবময় দিন ও বিপ্লবের মহান বাস্তবতা শিখিয়েছে।

শত্রুদের মারধোর এবং অত্যাচারের সঙ্গেও পড়াশুনা চালিয়ে গেছি। এজন্য আমরা সিমেন্ট ব্যাগের কাগজ, মিষ্টির বাক্সের কাগজ, সৈন্যদের ফেলে দেওয়া সিগারেটে প্যাকেট আমাদের কাজে লাগে। বাঁশের ছোট কাঠিকে আমরা পেনসিল হিসাবে ব্যবহার করি।

ঘরের ঝুলের সঙ্গে জল মিশিয়ে তৈরী হয় কালি। এইভাবে সংগ্রহ করা কাগজ নীচু ক্লাসের ছাত্রদের জন্য রেখে দেওয়া হয়। অন্যরা সকলেই প্রায় ঘরের মেঝেতেই লেখে এবং পড়ে। আমরা নগুএন ভু, নগুএন ট্রাই, হো খুড়ো এবং টু হু-র কবিতা শিখেছিলাম।

কবিতা যদি কারারক্ষীদের হাতে পড়ত, তবে আমাদের উপর চলত মারধোর। নগুএন দূর কবিতা ক্ষেত্রে অত্যাচারের পরিমাণ ছিল স্বল্প! হো খুড়োর অথবা বিপ্লবী কবিতা হলে অত্যাচারের সীমা থাকত না। লেখাপড়ার বিপদ সত্বেও, তা আমরা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিলঃ 'পড়, আবার পড়, অবিশ্রাম পড়ে যাও।' অন্য ক্যাম্পে চলে যাওয়ার আগে শ্রীমতী কে রাত জেগে অন্ধকারে তার পরীক্ষার পড়া শেষ করে। একজন মহিলার দেহে কারারক্ষীরা খুজে পায় কারাগারের অত্যাচারের বিবরণ। তাকে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হয়।

মে ১৯ অথবা সেপ্টেম্বর ২ * লেখা কোন কাগজের টুকরো যদি ওদের হাতে পড়ত তবে প্রহার অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হতাম। আমাদের শত্রু এই তারিখ দুটোতে ভয় পেত। শ্রীমতী এইচ যোনীপথে আঘাতে ভুগছিল। কুকুর দিয়ে তাকে ধর্ষণ করান হয়। মৃত্যুর আগে সে তার সঙ্গীকে একটি সিমেন্ট ব্যাগের কাগজ দিয়ে যায়। কাগজটি ধোয়া পড়েছিল পাঁচবার। আমরা ঠিক করেছিলাম একটি কাগজ সাতবার ধোয়ার পর আর ব্যবহার করা যায় না। কাগজটি ধোয়া হয়, শুকান হয়, বার বার লেখা হয় ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। একটুকরো কাগজের জন্য কখনও কখনও আমাদের রক্তও দিতে হয়।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিখি সঙ্গীত, সেলাই এবং রান্না।

---

* প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের জন্মদিন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায়, হাতে কলমে শেখার অসুবিধা ঘটায় রান্নার ব্যাপারটা মুখে মুখে সারতে হত। আমরা জানতাম, অন্যকে শেখাতাম। যে কেউ শিক্ষক এবং ছাত্র হতে পারত। নিয়মিতভাবে পরীক্ষা হত। স্কুলের পরীক্ষা শেষে আমরা উঁচু ক্লাসে উঠতাম। জেলে ঢোকার আগে যারা অক্ষর চিনত না, সাত বছরে তারা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেখে জেলের মধ্যে।

পড়াশুনার জন্য রক্তপাত না ঘটা পর্যন্ত আমাদের পেটান হত। কখনও রক্ত ঝরত ভয়ঙ্কর ভাবে। পশু সদৃশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের প্রবঞ্চিত করার জন্য বলত, ওদের বিয়ে করলে, আমেরিকায় আমাদের ভাল ব্যবস্থা করে দেবে। তা প্রত্যাখ্যান করে জেলেই আমরা পড়াশুনা চালাতাম।

কমরেড নগুএন থি মিন, ভো থি সাউ এবং অন্য বোনেরা কি শৌর্য ও দুর্দমনীয় ভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিল তা শিখেছিলাম ইতিহাস থেকে। লেখাপড়া শেখা ছিল আমাদের বলিষ্ঠ উদ্দীপনা। আমাদের মনোবল বাড়াতে এবং সংকল্প দৃঢ় হতে শিখেছি এদের থেকে।

হোয়াঙ থি কিম ডুং

পাঁচ

কনসন (পাওলো কনডর) পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মার্কিন কংগ্রেসের দুজন সদস্য উইলিআম আর অ্যানডারসন এবং অগাসটাস এফ হকিনস্। সঙ্গে ছিলেন মার্কিন লেখক ডন লুইস। পাওলো কনডরের অভিজ্ঞতা ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান তারা।

তারা বলেছিলেন, পাওলো কনডরে প্রায় দশ হাজার মানুষকে আটক রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচশ জন 'বাঘের খাঁচায়' কাটাচ্ছে দীর্ঘকাল। তাদের অর্ধেকই হল মহিলা। কনক্রিটের সেলের মধ্যে ওদের রাখা হয়েছে গাদাগাদি করে—চূনের পাওডার স্প্রে করে ওদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে—বেশীর ভাগ পুরুষের পা ভেঙে গেছে—উঠে পর্যন্তও দাঁড়াতে পারে না তারা—

অ্যাণ্ডারসন বলেন: 'এ পর্যন্ত আমি যা দেখছি, তার মধ্যে এটিই সম্ভবত মানুষের নৃশংসতম আচরণ।'

মার্কিন সূত্র থেকে জানা গেছে কারাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য আমেরিকা সায়গন কর্তৃপক্ষকে বছরে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলারেরও বেশী সাহায্য করে। একমাত্র পাওলো কনডরে বারজন মার্কিন উপদেষ্টা আছে।

তিনজন আমেরিকানই মার্কিন নৃশংসতার পরিচয় তুলে ধরেন। সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে আছে শত শত পাওলো কনডর আর সন মাই (মাই লাই)। সেখানে মার্কিন আগ্রাসক এবং তাদের তাঁবেদার সরকার সব থেকে নিকৃষ্ট মানব বিদ্বেষী নির্যাতন চালাচ্ছে দেশপ্রেমিক আর সাধারণ নিরীহ নাগরিকের ওপর। পাওলো

কনডরে বন্দী কয়েকজন দক্ষিণ ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিক মুক্তির পর সাংবাদিকদের কাছে তাদের দুঃসহ নির্যাতনের বহু বিবরণ জানিয়েছেন।

বিন দিন প্রদেশের ফুমাই জেলার মাই থঙ গ্রামের ট্রান থামকে চোদ্দ বছরের জেল দেয় সায়গনের পুতুল সরকার। শেষের দু'বছর (১৯৬৭ খৃঃ এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ খৃঃ জুন) সে ছিল পাওলো কনডরে।

'আমাকে তিনবার 'বাঘের খাঁচায়' ঢোকানো হয়। মোট পঁচাত্তর মাস ছিলাম সেখানে। ১'৫ মিটার চওড়া ২ মিটার উঁচু খাঁচাতে আমাদের রাখা হয়। প্রতিটি খাঁচায় থাকত আটজন। একটা বড় লোহার রডের সঙ্গে আমাদের পায়ে বেড়ি বাধা থাকত।

ওপরের রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ওয়ার্ডেন আমাদের প্রতিদিনের খাবার ফেলে দিত। বাসী ভাত, এক কণা লবন, একটু পঁচা মাছ-ছিল কুইনাইনের মতই বিস্বাদ। সেলগুলিতে স্থান বদল করে ওরা আমাদের একঘেয়েমি দূর করত। স্নানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ওরা কখনও সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের মাথার ওপর ঢেলে দিত এক বালতি নোঙরা জল—এটাকে অবশ্য ওরা স্নান করা বোঝাত।—'

সায়গনের তেত্রিশ বয়স্কা শ্রীমতী নগুয়েন থি হঙ বলেনঃ 'মার্কিন ভাড়াটেরা আরও ত্রিশ জনের সঙ্গে আমাকে পাওলো কনডরে পাঠায়। ততদিনে আমার দেহের আধখানা প্রায় অবশ হয়ে এসেছে। বাকী অংশ কখনও কখনও অসাড় হয়ে পড়ে। তা সত্বেও ওরা আমাকে অন্ধকারে ফেলে রেখে দেয়। যখন তখন ওরা আমার ওপর অত্যাচার চালাত, সাঁড়াশি দিয়ে মাংস টেনে ধরত। চোখে মুখে চুন ঢেলে দিত। মাথার ওপর ক্রমাগত জল ঢালত।

ব্লাডহাউণ্ড ছেড়ে দিত। তার ওপর যে ছয় সাত মাস আমি পাওলো কনডরে ছিলাম। কখনও স্নানের সুযোগ ঘটেনি, এমন কি মাসিকের সময় পরিষ্কার হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেতাম না।'

চৌত্রিশ বছরের ট্রান তু-র বাড়ী হল কুয়াঙ গ্রামে। অভিজ্ঞতা থেকে সে বলেছে: 'পাওলো কনডরে পা দিয়ে সর্বপ্রথম পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরে দুটি মার্কিন বিমান ক্ষেত্রের অফিস দেখলাম। সেখানে মার্কিন পতাকা উড়ছিল। দু'তিন দিন অন্তর দুজন আমেরিকান একদল উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে জেলখানা পরিদর্শন করত। পরে শুনেছিলাম এরা সায়গন সরকারের জেল উপদেষ্টা।'

'কনসন দ্বীপ, জাতীয় সংশোধন কেন্দ্র। সায়গনের ১৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত। ভিয়েতনামের সর্ব বৃহৎ সংশোধন প্রতিষ্ঠান। অপরাধীদের এই কালোনি ১৮৯২ খৃঃ ফরাসীরা স্থাপন করে। দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত ছিল 'শয়তানের দ্বীপ' নামে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা সত্বেও সেই পরিচিতি এখনও বর্তমান।'

—সুন্দরী কনসন দ্বীপের দিকে যখন এগিয়ে চলেছিল বিমান, তখন এই কথাগুলিই ভাসছিল মনে।

কংগ্রেস সদস্যরা হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রাক্তন বন্দীরা কারাজীবনের বীভৎস কাহিনী জানালেও মার্কিন উপদেষ্টারা প্রচার করে এক উজ্জ্বল জীবনের চিত্র। অন্য অনুসন্ধানকারী দল কিছুই দেখতে পায়নি। ফরাসী আমলে পশ্চিমীরা দেখেছিল বাঘের খাঁচা, আবার অনেকেই এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সরকারী কর্তাব্যক্তিরা দ্বীপ পরিদর্শনকারীদের বলেন, এখানে কোন বাঘের খাঁচা নেই। সেটা সম্পূর্ণ অতীতের ব্যাপার। তাদের এ কথাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কারণ বন্দীরা গোপনে জানায়, 'আপনারা অবশ্যই বাঘের খাঁচা দেখবেন।'

দলটি তিনটি জীপে করে গেল দু'নম্বর ক্যাম্পে। সার বেঁধে দাঁড়াল বন্দীরা। মুখ শক্ত, ভয়ে বিবর্ণ।

চিকিৎসা সম্পর্কে বন্দীরা জানাল :

'আমাদের একজন ডাক্তার আছেন। তিনি প্রত্যেককে দেখেন আলাদাভাবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা বেশ আধুনিক।'

অসুস্থ বন্দীদের কাছে কংগ্রেস সদস্যরা কয়েকটি কথা জানতে চাইলেন :

'তোমরা কি ঠিক পরিমাণ মত খাবার পাও ?

'হ্যাঁ, প্রচুর। ভাত, শুকনো মাছ এবং সব্জী।'

'তোমরা ওষুধ পাও ?'

'হ্যাঁ, আমরা প্রতিদিন ওষুধ পাই।'

প্রশ্ন চলছিল। আমি নির্জনে একজনের সঙ্গে কথা বলে বিস্মিত হলাম। সে আমায় বলে :

'দিয়েম আমল থেকে আমি একজন রাজনৈতিক বন্দী। কবে মুক্তি পাবো, তা আমি জানি না। জায়গাটা একেবারে জঘন্য। গুরুতর অসুস্থ কাউকে আপনি দেখেছেন ? এক বোতল জল দেওয়ার পর থেকে, ওরা আজ পর্যন্ত কোন ওষুধই পায়নি। সেটা আপনি দেখবেন। কোন ওষুধ নেই ! কোন সব্জী পর্যন্ত নেই— !'

সে সময় একজন গার্ড এগিয়ে আসায়, সে বলতে থাকে :

'এখানে সব কিছুই আশ্চর্য রকম ভাল। মূল ভূখণ্ডের মত অবস্থা এখানে নয়। আমরা প্রচুর খেতে পাই। এখানকার লোকজনও যথেষ্ট হৃদয়বান।'

আমি চলে যাচ্ছিলাম, আর বন্দীর ভয়ার্ত চোখ দুটো অনুসরণ করছিল আমাকে।

তখন জেল কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে, আমি ভিয়েতনামী

ভাষা বলতে পারি। তারপর থেকে ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে আমি যেন কোন বন্দীর সঙ্গে একাকী, কথা বলতে না পারি।

বন্দীরা কী খেলাধূলা করতে পারে? আমি জানতে চেয়েছিলাম। মার্কিন জন নিরাপত্তা পরামর্শ পরিকল্পনার অন্তর্গত সংশোধন ও বন্দী বিভাগের প্রধান র‍্যাণ্ডলফ বার্কলে জানান:

'কর্ণেল ভে বন্দীদের সঙ্গে ফুটবল খেলেন। সে ওদের এত প্রিয়।'

কর্ণেল ভে বললেন, 'আমি প্রতি রবিবার বিকেলে ফুটবল খেলি ওদের সঙ্গে। এমনকি, কখনও কখনও ওরা আমাকে পেটায়, কিন্তু ওদের আমি কিছুই বলি না।' পরিহাসে কর্ণেল ভে আনন্দে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কংগ্রেস সদস্য হকিন্স বললেন, আমরা চার নম্বর ক্যাম্পে যাবো। আমরা জীপে উঠলাম; কিন্তু পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। টমাস হারকিনের দোভাষীর কাজ করতে বলা হল আমাদের। সে সময় পাশে ছিল গার্ড দাঁড়িয়ে।

—তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—বেন ট্রি।

—কখন তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়?

—দশ বছর আগে।

—কেন তোমাকে ধরা হয়েছিল?

—আমি একজন রাজনৈতিক বন্দী।

—কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল?

—প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ আমাকে ধরে নিয়ে যায়।

গার্ড বলল: 'তোমাকে ধরার কারণ তুমি একজন বিশ্বাস-ঘাতক।'

পুনরুক্তি করল বন্দী: 'আমাকে ধরা হয়েছিল, কারণ আমি একজন বিশ্বাসঘাতক।'

আর একজন বন্দী জানায়, ওকে ধরার কারণ সে জানে না।

কর্ণেল ভে কর্তৃত্বসুলভ সরব কণ্ঠে বলল: 'তোমার হাতে ছিল গ্রেনেড। তুমি জনগণকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। এটা সত্যি নয় কি?'

'আমার হাতে ছিল গ্রেনেড এবং আমি জনগণকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম'—বন্দীটিও বলল।

একটার পর একটা এক ধরণের ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। গার্ডরা ঘিরে থাকবার সময় বন্দীরা জানায় ওরা খাবার পায় প্রচুর। আর গার্ডরা না থাকলে বলে, সত্যি কথা বলতে কিছুই খেতে পাই না। আমরা বাড়ী থেকে চিঠি পাই—তা অবশ্য গার্ডদের শুনিয়ে পড়তে হয়। তাদের না শুনিয়ে কোন চিঠি হাতে নিতে বা পাঠাতে পারি না।

পাঁচ নম্বর ক্যাম্প দেখা শেষ হলে হকিন্স চার নম্বর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার অনুরোধ করেন। আমরা শুনেছিলাম এখানেই আছে কুখ্যাত বাঘের খাঁচা। যা আগেই জেনেছি, কমপাউণ্ডে ঢুকেই চোখে পড়ে সেই দৃশ্য। বিভিন্ন মানুষের কাছে শুনেছি আমরা অনেক কিছু। এক প্রান্তে দুটি ইঁদারা। তার সামনে চৈনিক রাজকীয় অলঙ্করণ সমৃদ্ধ দেওয়াল। কয়েকটি সুন্দর ফুলের ফোটো তুললেন একজন প্রতিনিধি। বন্দীশালা এবং ইঁদারার মাঝে সরু গলিপথ প্রথমে আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এটি প্রথমে চোখে পড়ে টমাস হারকিনসের। দুটি দেওয়ালের মাঝ পথে সব্জী চাষ করা হয়েছে। হারকিনস বললেন:

'কর্ণেল, এখানে আপনাদের কৃষিপ্রকল্প দেখে সত্যিই খুশি। এগুলি কি গাছ?'

কর্ণেল ভে জানালেন: 'এগুলি হল ভিয়েতনামী শাক। বন্দীরা বিশ্বস্ত প্রমাণ দিলে, তাদের আমরা চাষে উৎসাহ দিয়ে থাকি।'

একজন কংগ্রেস সদস্য গলি পথে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, এই ছোট দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

আমরা দরজা ধরে নাড়াচাড়া করি। আঘাত করতে থাকি। একেবারে ছোট দরজা। একজন লোক ঢুকতে পারে, এত ছোট।

কর্ণেল ভে বললেন, 'ওটা গেছে অন্য ক্যাম্পে। অপর দিক দিয়ে আমরা ঢুকতে পারি।'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। বাঘের খাঁচার সন্ধান জানেন এমন একজন আমাদের বলেছিল:

'সেখানে ঢোকার পথ একটি। শাকসব্জী জন্মেছে সেই পথের একেবারে শেষে ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

প্রতিনিধি হকিন্স বললেন, 'আমি ক্লান্ত। আপনি অপর দিকে কাউকে পাঠিয়ে কি দরজাটা খুলে দিতে পারেন? আমরা বরং এখানে অপেক্ষা করি।'

টমাস হারকিন্স আবার অনুরোধ করলেন, 'কংগ্রেস সদস্য ক্লান্ত আপনি কি কাউকে পাঠিয়ে অন্য দিক দিয়ে দরজাটা খুলে দিতে পারেন?'

'এই দরজা সব সময় তালা বন্ধ থাকে। আপনারা ভিতরে ঢুকতে পারবেন না।' —কর্ণেল বললেন।

আশ্চর্য জনক ভাবে, ঠিক সেই সময়ে দরজার ওপাশে কেউ এসেছিল। ব্যাপারটা কি ঘটছে দেখবার জন্য সে দরজা খুলতেই আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ি। সেখানে বাঘের খাঁচাগুলি আমরা দেখতে পাই। আমরা ওপরে লাফিয়ে উঠি। নীচের

প্রতিটি খাঁচাতে তিন বা চারজন বন্দী রাখা হয়েছে গাদাগাদি ভাবে।

বাঘের খাঁচাগুলি পাথরের ছোট্ট কামরা। প্রতিটি খাঁচার মধ্যে আছে একটি করে কাঠের পাত্র মলমূত্র ত্যাগের জন্য, তা দিনে একবার পরিষ্কার করা হয়। খাঁচাগুলি লম্বায় পাঁচ ফিট এবং চওড়ায় পাঁচ ফিটও নয়। প্রতিটিতে তিনজন করে বন্দী। তাদের দেখার জন্য আমরা সিড়ি পথে ওপরে উঠি। সেখান থেকে বন্দীদের দেখা যায়। ওপরে লোহার মোটা রড বসান। বাড়ীটাতে ষাট সত্তরটি খাঁচা ছিল।

একজন বন্দী ফরাসীতে কথা বললে, তাকে আমি ভিয়েতনামীতে বললাম, 'দুঃখিত, আমি ফরাসী বলতে পারি না। কিন্তু আমি ভিয়েতনামী ভাষায় কথা বলতে পারি। আমরা এসেছি আমেরিকা থেকে, কংগ্রেস প্রতিনিধিদল। আমরা দেখতে চাই ভিয়েতনাম কারাগারের পরিস্থিতি।'

'আমরা তৃষ্ণার্ত। ক্ষুধার্ত। আমাদের মারধোর করা হয়েছে।' একজন বলল। আর একজন বলল, 'আমি শান্তি চেয়েছিলাম, তাই আমি এখানে বন্দী। সব ভিয়েতনামীই তাই চায়। আমরা চাই কেবল মাত্র শান্তি।'

ঘুরান সিড়িপথ বেয়ে আমরা নেমে আসি তাদের ওপর। বন্দীরা তাদের দেহের ক্ষতস্থান দেখায় আমাদের। একজন তার হাত দেখায়। সেখানে কোন আঙ্গুল নেই।

সে বলল, 'গ্রেপ্তার করার সময় ওরা আমার আঙ্গুল কেটে নেয়।' তারপর সে মাথা ঘুরিয়ে, মাথার পিছনের মস্ত ঘা খানা দেখায় আমাদের।

তাদের কেউ উঠে দাঁড়াতে পারে না। খাঁচার একধারে একটি গরাদের মধ্যে ভরে কয়েকদিন আগে তাদের বেদম পেটান হয়েছিল।

প্রহারের চিহ্ন, বন্দীদের ফিরে আসার পায়ের দাগ তখনও ছিল।

একজন হাতের ওপর নির্ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে পারত খাঁচার মধ্যে। সে জানাল, 'কয়েকদিনের মধ্যে আবার আমাদের পেটান হবে এই ভাবে।'

অক্ষম দুটি পায়ে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়ে একজন বন্দী বলল, 'মাসের পর মাস আমাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং অসুস্থ। দয়া করে আমাদের একটু জল দিন।'

'আমি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ১৯৬৬ খৃঃ আমি শান্তির কথা বলেছিলাম। শান্তি চাওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণে আমাকে এখানে আনা হয়নি। আমাকে প্রহার করা হয়। শৃঙ্খলিত করা হয়। কিন্তু, আমি শান্তির আবেদন জানাবই।'

প্রতিটি সেলের উপর ছিল কাঠের পাত্রে চুন।

আমরা কর্ণেল ভের কাছে জানতে চাইলাম, 'এ দিয়ে কি করা হয়।'

কর্ণেল জানাল, 'দেওয়াল হোয়াইট ওয়াস করার জন্য এই চুন ব্যবহার করা হয়।'

বন্দীরা চীৎকার করে উঠল, 'নাঃ নাঃ এই চুন আমরা খাবার চাইলে আমাদের ওপর ছুড়ে মারা হয়।'

অনেকগুলি খাঁচার মেঝেতে ছিল চুন পড়ে।

'এগুলি ছোড়ার সময় আমরা কাশতে থাকি এবং রক্তবমি করি। আমাদের অনেকেই ভুগছি যক্ষায় এবং যখন চুন ছুড়ে মারা হয়, তখন নিশ্বাস নেওয়া হয় খুবই কষ্টকর।'

'এখানে আরো অনেক বাঘের খাঁচা আছে। সেগুলি আপনারা অবশ্যই দেখবেন'—ওরা বলল, 'তাদের আর্তনাদ শুনতে পাই এবং খুবই কাছে। সেখানে যান।'

আমরা নেমে এলাম সিড়ি দিয়ে এবং পাশের বাড়ীতে ঢুকলাম। এখানেও পুরুষদের খাঁচার মত দু'সারি খাঁচা দেখতে পেলাম। প্রতিটি খাঁচায় পাঁচজন করে মহিলা। বন্দীদের মধ্যে আছে পনের বছর বয়স্ক থেকে বৃদ্ধা। একজন প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক অন্ধ মহিলাও আছে।

'আমাদের একটু জল দিন। দয়া করে আমাদের কিছু খেতে দিন,' ওরা অনুরোধ করল।

'আমরা এখানে সাত মাস আছি। এই সাত মাসে আমাদের তিনবার মাত্র সব্জী খেতে দেওয়া হয়েছে।'

'আমাদের প্রচণ্ড প্রহার করা হয়েছে। আমরা অসুস্থ কিন্তু এখনও আমরা কোন ওষুধ পাইনি।'

মহিলাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ। কয়েকজনের যক্ষা, কয়েকজনের চোখের অসুখ। বেশীর ভাগেরই চর্মরোগ। গুরুতর পীড়িতরা পড়ে আছে ছোট্ট খাঁচার মেঝেতে। আর অন্যরা পুরোন ছেড়া কাঁকড়া দিয়ে হাওয়া করছে তাদের।

একজন সুন্দরী যুবতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার বয়স কত?'

'আঠার।'

'তুমি কী ছাত্র?'

'না, আমি একজন শ্রমিক। একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম।'

'তোমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়?'

'কারণ, আমি শান্তি বিক্ষোভে ছিলাম।'

'তুমি কি কমিউনিষ্ট?'

প্রশ্ন শুনে মেয়েটি এমন ভাবে হেসে উঠল, যেন এই জিজ্ঞাসা অত্যন্ত অসার।

'না, আমি কমিউনিষ্ট নই। রাজনীতির সঙ্গে কোন যোগ নেই আমার। আমি শান্তির সঙ্গে জড়িত।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডটি ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এই পতাকাকে অভিবাদন করবে?'

'না! না! তোমরা আমাদের ওপর যা করেছ তার প্রতীক ঐ পতাকাকে কখনই সম্মান জানাব না।' সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

সায়গনের বিখ্যাত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গিয়া লঙ, মাদাম কুরি, ইত্যাদি বিদ্যালয়ের বহু মেয়ে ছিল বন্দীদের মধ্যে।

তারা জানাল, 'দু তিন দিন বাদে বাদে আমরা স্নান করতে পারি। তারপর আর জল থাকে না। মাসিকের সময় আমরা খুব কষ্টে পড়ি, কারণ আমরা সে সময় ঠিক মত পরিষ্কার থাকতে পারি না। সেটা খুবই অস্বাস্থ্যকর।'

বাঘের খাঁচায় প্রায় পাঁচশ বন্দী আছে। তারা ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত এবং বহুবার প্রহারের চিহ্ন রয়েছে তাদের দেহে।

সায়গন ত্যাগের সময় কনসন সম্পর্কে আমাদের কাছে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এই জীবনের কোন মিল নেই। বলা হয়েছিল:

'বন্দীরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। যেমন, কাঠ কাটা, ইট তৈরি, কাঠের আসবাব পত্র তৈরি, পশুপালন, মুরগী ও হাসপালন এবং সেলাই, সাহিত্য শিক্ষার ক্লাসে তারা যোগ দেয় এবং সব ধরণের সাধারণ শিক্ষা পায়। চাউল, পেঁপে, নারকেল এবং সব্জী উৎপন্ন হয় কারাগারের খেতে এবং বন্দীরা যে সব মাছ ধরে তা, খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত পায়।—'

বাঘের খাঁচা ছাড়ার সময় আমরা যা শুনেছিলাম সেটিই হল উৎকৃষ্ট পরিচয়: 'দয়া করে একটু জল দিন আমাদের।'*

* দুজন কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে ডন লুইসের কনসন পরিদর্শনের পর ১৯৭০ খৃঃ কয়েকটি কাগজে প্রকাশিত বিবরণ অনুসরণে।

চিন হোয়া কারাগারে দীর্ঘ কয়েক মাস বন্দী থাকবার পর জেল প্রধানরা আমাদের 'কঠোর শ্রমের' বিধান দেয়। সেই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের কনসন দ্বীপের কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমরা এই আজগুবি সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারি নি। যাই হোক, আমাদের একটি ঢাকা দেওয়া ট্রাকে উঠান হলো, তারপর নৌবাহিনীর যান ৪০৩-এ করে নিয়ে যাওয়া হল কনসন দ্বীপে। সব সময় আমাদের পায়ে ছিল বেড়ি দেওয়া শিকল। কনসন দ্বীপে আমাদের অভ্যর্থনা করল তিনশ 'বিশস্ত' কর্মী, যারা নির্যাতনে বিশেষজ্ঞ।

আমাদের মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য করা হয়, গালাগলি করতে থাকে, মারধোর করে এবং দ্রুত হেঁটে যেতে হয়। ঐসব চাকরেরা ব্যাঙ্গ করে বলে, 'এই হলো কনসন, বাচ্চারা, তোমাদের শেষ স্থান।' বিন হোয়ার ষাট বছরের এক জন বৃদ্ধের পক্ষে এত দুর্ভোগ সহ্য করা ছিল কষ্টকর, তাকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে খুনীরা বলে: 'যদি তুমি মার না খেতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি চল, বুঝতে পারছ, খোকা?' ক্রমাগত বৃদ্ধ মানুষটিকে তারা মেরে চলেছিলো। অন্যদের তুলনায় সেদিন এই লোকটি'ই সব থেকে বেশী নির্যাতিত হয়। সেইদিনই আমাদের শিকল বাঁধা অবস্থায় পাঠানো হয় বাঘের খাঁচায় এবং মুক্তির দিন পর্যন্ত ছিলাম সেখানে। এই ঘরের ছোট খাঁচাগুলি তিন মিটার লম্বা ও দেড় মিটার চওড়া এবং এগুলি ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আমাদের পাঁচজনকে ঢোকান হয় এই রকম একটি খাঁচায়। মাত্র এক হাত পরিমাণ জায়গায় প্রত্যেককে থাকতে হত। পাঁচ মিটার লম্বা এক লোহার রডের সঙ্গে আমাদের পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত খাওয়া, ঘুমান, স্নানের সময় পর্যন্ত। সেই গরম, অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ স্থানে আমাদের নীরব থাকতে বাধ্য করত। প্রায় এক মিটার পুরু পাথরের দেয়াল ছিল প্রতিটি খাঁচার মাঝখানে। প্রতিটির

ছিল শক্ত করে বন্ধ করা ছোট দরজা, যা খাবার ছুড়ে ফেলার জন্য দিনে একবার খোলা পড়ত মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। ছাদ ছিল লোহার রড দিয়ে তৈরী। সেখানে প্রহরীদের সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথ ছিল। প্রথম মাসে সারা দিন আমাদের শুয়ে থাকা, বসা বা দাঁড়ান ছিল নিষিদ্ধ। কথা বলা ছিল বারণ। ফিসফিস করে কথা বললেও জঘন্য মারধোর চালাত। ওপরের টালির ছাদ এত ফাঁকা ছিল যে, বর্ষার সময় অঝোরে জল পড়ত, প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে আসত বালি আর নুড়ি। মেঝে ছিল অসমান, বালি আর কাঁকরে ভর্তি। কয়েক বছর পরিষ্কার না হাওয়ায় ভয়ঙ্কর নোংরা। প্রথম চার মাস আমরা ছিলাম ওখানে। এখন সেখানে জায়গা হয়েছে মেয়ে বন্দীদের।

ফরাসী আমলে তৈরি একটা পুরোন আস্তাবলের কাছে, "আস্তাবল কেন্দ্রে" আমাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। এগুলি তৈরি করা হয় ১৯৭০ খৃঃ। প্রতিটি ঘরে সতেরজন বন্দী থাকত। বাঘের খাঁচার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য কেবল বৃহৎ আয়তন ও মাত্রাতিরিক্ত গরমে। ব্যবস্থা ছিল একই রকম: হাতকড়া, পায়ে বেড়ি এবং নোংরা খাবার।

দ্বীপের আটক আট হাজার মানুষ—সেলব্লক, ক্যাম্প বা ভূগর্ভ খাঁচা যেখানেই রাখা হোক না কেন ব্যবস্থাপত্রে কোন বৈসাদৃশ্য ছিল না। সামরিক, রাজনৈতিক, সাধারণ, নারী ও শিশু বন্দীদের জন্য একই ধরনের আচরণ। তাছাড়া নিবর্তনমূলক আটক আইনের তেইশ শত বন্দীকেও ওরা পৃথক করেনি।

প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে হয়, সারা বছর ধরে বন্দীদের সাধারণতঃ দুই ধরনের খাবার দেওয়া হত: মাছের তরল পিণ্ড এবং লবণে শুকোন মাছ, ভাত। স্বল্প পরিমাণই কেবল নয়, এসব ছিল নিকৃষ্ট স্তরের।

তাছাড়া বন্দীদের খেতে হত, খুবই কম সময়ের মধ্যে। বাঘের খাঁচার বন্দীদের জন্য ছিল মাত্র তিন মিনিট। ফলে অতি অল্প বরাদ্দও তারা সেই সময়ে খেতে পারত না। ভাত রান্না হত বেশী পরিমাণ জল দিয়ে; খাওয়ার দু'এক ঘণ্টা বাদেই বন্দীদের আবার ক্ষিদে পেত। এর ওপর ভাতে মেশান হত বালি এবং কাঁকর। যতদিন পর্যন্ত বন্দীরা নিজেদের দাবী সম্পর্কে সোচ্চার না হত ততদিন প্রচণ্ড ক্ষুধা যন্ত্রণা ভোগ করতে হত তাদের। ভাতের সঙ্গে কিছু না পেলে আমাদের পক্ষে তা গেলা সম্ভব হত না। কিন্তু একমাত্র পচা শুকনো মাছ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বিস্বাদের জন্য আমরা এর নাম দিয়েছিলাম কুইনাইন মাছ।

বছরের পর বছর টাটকা খাবারের অভাবে আমাদের দাঁতের মাথা নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিকারে আমরা 'সব্জী' খাওয়া শুরু করি। টয়লেট পেপার হিসাবে ব্যবহারের জন্য যে গাছের পাতা দেওয়া হত, শেষ পর্যন্ত তাই হলো 'সব্জী'। তাছাড়া মাছি, ছারপোকা, উকুন, উইপোকা, গুবরে পোকা এবং টিকটিকিও ধরতাম আমরা। সেগুলি আমাদের মধ্যে ভাগ হত। বেশী পেত অসুস্থরা। এগুলি ছিল আমাদের একমাত্র ভিটামিনের উৎস। কয়েক বছরের মধ্যে আমরা একটা ওষুধের ট্যাবলেট পাওয়া দূরের কথা, টাটকা সব্জী পর্যন্ত পাইনি। জিজ্ঞাসাবাদের ঘর থেকে ফেরার সময়, মারের চোটে যখন আমাদের ক্ষমতা থাকত না চলবার, তখন পথের দু'পাশে ঘাস উঠিয়ে বগলের নীচে লুকিয়ে ঘরে নিয়ে আসতাম অসুস্থ সহবাসীদের জন্য। এর দরকার ছিল, কারণ তাছাড়া টাটকা সব্জী সংগ্রহের কোন উপায় ছিল না।

খাঁচায় ঢোকবার আগের দিন, ওরা আমাদের কাপড়-চোপড়, টাকা পয়সা, ওষুধ পত্র এবং অন্যান্য সব জিনিস লুঠ করে নেয়। সবকিছু তারা স্তূপ করে রেখেছিল। ওরা অবশ্য খাতাপত্রে

দেখায় সুশৃঙ্খল বন্দীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা সংগৃহীত, যদিও তাদের কাছে টাকা পয়সা রাখার কোন অনুমতি ছিল না। এক শত থেকে পনের শত পর্যন্ত পিয়েষ্ট্রা খোয়া যায়। তথাকথিত পুনর্শিক্ষা-কেন্দ্রে আমার নিজের সবকিছু খোয়া যায়। এমনকি আত্মীয়ের পাঠান প্যাকেটগুলো পর্যন্ত। এই অন্যায় ও ডাকাতি বন্ধ করতে অপরাগ হয়ে, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করি আমরা। উত্তরে জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চি ন রঙ তার চাকরদের বন্দীদের ওপর নৃশংস ভাবে প্রহারের নির্দেশ দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার সাহসকে ভেঙে দিতে চায়। অন্য সব অভিযোগপত্র ছুড়ে ফেলে দেয় ছেঁড়া কাগজের বাক্সে।

বন্দী হওয়ার প্রথম মাসগুলিতে মাসে একবার স্নানের সুযোগ ছিল। আমাদের পাঁচজনকে এক জায়গায় জড় হয়ে বসতে বলা হত, লোহার রডের সঙ্গে পায়ে থাকত বেড়ি লাগান, তারপর ঢেলে দিত এক পাত্র জল আমাদের মাথার ওপর। একবারও আমাদের সমস্ত শরীরে জল লাগত না। শেষের তের মাস আমরা মুখ ধোয়া বা দাঁত মাজতে পারিনি। আমাদের পক্ষে এগুলি ছিল নিষিদ্ধ। আমাদের টয়লেট পেপার দেওয়া হত না। জামার ছেঁড়া টুকরো দিয়ে কাজ সেরে, নিজেদের প্রস্রাব দিয়ে তা ধুয়ে ফেলতাম।

কনসন কারাগারে ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি কারণে অভিযুক্ত অপরাধীরাও ছিল। পাঁচ বছর থেকে কুড়ি বছরের জেল মেয়াদে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা হত্যা করা হত তাদের। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল সেনা বাহিনীর লোক। যত্ন নিয়ে, শিক্ষার আলোয় তাদের নৃশংসতার পথ থেকে সরিয়ে এনে ভিয়েতনাম গঠনের কাজে নিয়োগ না করে, জেল কর্তৃপক্ষ তাদের খুনী প্রবৃত্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আরও বেশী খুনের প্রতি তাদের উৎসাহিত করা হয়।

সাধারণ কিছু অপরাধী এই জঘন্য জালে জড়িয়ে পড়ে, নিজেদের

বিবেক বিক্রি করে শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী দালালে পরিণত হয়। বিভিন্ন সেল ওয়ার্ড ও ক্যাম্পে অবরুদ্ধ বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাবার ক্ষমতা পেয়ে সংশোধনকারী ক্যাডারে পরিণত হয় তারা। নির্যাতন, খুন ও গুপ্ত হত্যা এইসব অমানবিক কার্যকলাপ চালিয়ে সুপারিনটেনডেন্টের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে, জেল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। এইসব 'সৎ আচরণের' জন্য ক্ষমা লাভ করে শাস্তি হ্রাস ঘটে। এইসব কারণে বন্দীদের খুন করা তাদের পক্ষে ছিল সহজসাধ্য ব্যাপার।

বিশাসভাজনদের নিষ্ঠুরতায় সায়গন প্রশাসকের প্রশ্রয় তাদের পাশবিকতাকে আরও ঘৃণ্য ও কলুষিত করে। বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া খেলা, ওষুধ ইনজেকশন এবং আফিং সেবনে প্রশ্রয় দেয়। ওয়ার্ডাররা চোরাই আফিং বিক্রি করে নেশাসক্তদের কাছে। জুয়াখেলায় জেল কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দেয়। বেশ্যাদের মূল ভূখণ্ড থেকে জাহাজে করে আনা হয় দলের পর দল। এইসব জীবন বিশ্বস্তদের ঝগড়া ও লড়াই বাধায়, গুপ্ত হত্যা করে। আমাদের মত রাজনৈতিক বন্দীদের অর্থ আত্মসাতের যে অধিকার তারা জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করে। তাদের অনেকে ৫০০,০০০ পিয়েষ্ট্রা পর্যন্ত জমিয়েছে, আবার অনেক অগুন্তি রাজনৈতিক বন্দী হত্যার পুরস্কার স্বরূপ মুক্তি পায়।

আমাদের অবিরত অভিশাপ, গালিগালাজ করা হত। সেই সঙ্গে চলত নির্দয় পিটুনি। কর্তব্যরত প্রহরীরা বন্দীদের উপর চুন ছুড়ে দিত, অনেকের দম বন্ধ হয়ে আসত, রক্ত বমি করত। শেষ ঘটনাটি ঘটে ডিসেম্বরে। মহিলাবন্দীদের ওপর চুন স্প্রে করা হয়। দুজন মারা যায় পিটুনিতে। ট্রু ক্যাম্পে অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করি, অনশন ধর্মঘট চালাই। এক সপ্তাহের বেশী চলে এই আন্দোলন! আমাদের বৈধ দাবী ওরা

শুনতে চায়ও নি। আমাদের সঙ্গী কুয়াঙ নাম প্রদেশের দিয়েন বান জেলার তেইশ বছরের হো ভন চিনকে হত্যা করা হয়। তার মৃত দেহ কেড়ে নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট দেয় রোগে মৃত্যু হয়েছে।

দ্বীপের শাসক লি কান ভে-র শাসনে সব সময় আমাদের প্রহার ও হত্যার ভয় দেখান হত। গরমে জামার বোতাম খোলা থাকলে, পা নাড়াবার সময় শিকলের আওয়াজ হলে, অফিসে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি চোখ মাটিতে না আবদ্ধ থাকত তাহলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে চলত খিস্তি এবং প্রহার।

চরম গুণ্ডামী চালাত ওরা। লাথি, লোহার রড এবং দরজার খিল দিয়ে পেটাত আমাদের দেহের ঘাড় বা অন্য স্পর্শকাতর অঙ্গে। তারপর আমাদের সারাদিন কাটাতে হত শিকল বাঁধা অবস্থায়। শেষ বছরে আটদিন আমরা শিকল খোলা অবস্থায় কাটাই শেষের চার দিন, ভুলান উৎসবের তিন দিন এবং মুক্তির আগের দিন। আমাদের কাছে এই 'সুযোগ' সত্যিই ছিল মূল্যবান। দীর্ঘ কয়েক বছর শিকল বাঁধা অসাড় ও চল-শক্তিহীন পা টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে যথেষ্ট আরাম বোধ করতে থাকি। সেই সুখকর মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারিনি। সেই সব মানুষের প্রতি সত্যি আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ যারা এইসব মহান উৎসবের প্রবর্তন করে, যা নির্যাতনকারীদের মানবিকতা বোধকে ক্ষণিকের জন্যও নাড়া দিয়েছিল। দুটি ভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত শিকলের প্রভেদ এখানে উল্লেখ করতে পারি:

—ফরাসী আমলে তৈরী বেড়ি ছিল মসৃণ, যার ফলে বন্দীরা খুব কম কষ্ট পেত।

—এখন বাড়ী তৈরীর এফ ৮ স্টীলে আমেরিকায় তৈরী শিকল ও বেড়ি ব্যবহৃত হয়। এতে থাকে তীক্ষ্ণ খাঁজা কাটা। জোর করে পা ঢোকাবার সময় মনে হবে হৃদয় বিদির্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিছু

কাল বাদে দাঁতগুলো বসে যায় মাংসের মধ্যে আর পায়ে সৃষ্টি হয় মর্মান্তিক ব্যথা। বিশেষ করে শুয়ে পাশ বদল করবার সময় তা হয় নৃশংস নির্যাতনের মত। এসব হল বর্তমান শাসকদের নৃশংসতা ও বর্বরতার আলেখ্য।

কঠোর শ্রমের বন্দীরা অধিক খাবার চাইলে তাদের ভূগর্ভ ওয়ার্ড দুই-এ আটকান হত। এটা ছিল সরু ও সম্পূর্ণ অন্ধকার জায়গা। আটকবন্দীরা ধীরেধীরে মারা যেত চরম ঔদাসীন্য, ঘৃণ্য আচরণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে। প্রায়ই শুনতে পেতাম: 'আমাদের একজন মারা যাচ্ছে', 'আমাদের একজন মারা গেছে'! এই কান্নার আওয়াজে আমাদের আত্মাও কেঁপে উঠত এবং নিজেদের পরিণতি চিন্তা করতাম।

সায়গন, ১ জুন, ১৯৭০।

কলেজের ছাত্র: ট্রন ভন লঙ

কাও নগুয়েন লঙ

নগুয়েন তুয়ান কিয়েত

হাইস্কুল ছাত্র: নগুয়েন মিন ত্রি

কনসন কারাগারের ৮,৯৪৫ জন রাজনৈতিক বন্দীর খাদ্য পরিমাণ ৬০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৪৫০ গ্রাম করা হয় মাত্র কয়েক মাস আগে! লবনের সরবরাহ অপর্যাপ্ত। গত কয়েক মাস সব্জী, মাংস, এমন কি পচা মাছ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক সংবাদ জগতে বাঘের খাঁচার নিন্দা করা হলেও, নতুন ও উন্নত ধরণের বাঘের খাঁচা তৈরি করা হয় ৮ নম্বর ক্যাম্পে! এখানে ৩০০ থেকে ৪০০ বন্দী আটক রাখা যায়। উন্নত ধরণের অর্থ হল আরো কম উঁচু, অন্ধকারময় এবং হাওয়া কম।

ইচ্ছাকৃত খুনের ঘটনা অসংখ্য: ১৯৭২ খৃঃ ১৫ মে, ওয়ার্ডেন

মুত্তই-ও একশত অধস্তন খুনীকে লাঠি ও বোতলে সশস্ত্র করে হামলা চালায়। ৫০ জন রাজনৈতিক বন্দী মারাত্মকভাবে জখম হয়। ২৭ জনের মাথায় আঘাত লেগে হাড় ভেঙে যায়। ক্যাম্পের হাসপাতালে এর ছবি নেওয়া হয়।

৬ নম্বর ক্যাম্পে ১৯৭১ খৃঃ সেপ্টেম্বরে অতর্কিত হামলার সময় দুজন রাজনৈতিক বন্দীকে প্রচণ্ড মারধোর করে ভাড়াটে খুনী বু। একজন বন্দী, ফম কান মারা যায়। ৪ নম্বর ক্যাম্পের ১১ নম্বর ঘরে ১৯৭২ খৃ. জানুআরি মাসে বন্দীদের ৫ নম্বর ক্যাম্পে সরাবার সময় অতর্কিত হামলায় দুজন বন্দী গুরুতর আহত হয়।

কনসনে বন্দী ডঃ ত্রিয়েতের ভাই ছাত্র নগুয়েন ভিয়েত হুঙকে হত্যা করা হয় ১৯৭২ খৃঃ অগাস্টে। গরুর খাঁচায় আটক এলাকায় ২৬ জন বন্দীকে হত্যা করা হয়। খুনীদের নাম জানা যায়। তারা হল থু ফুক এবং বা দাং। এরা 'বিশেষ হ' গ্রুপের লোক।

৬ নম্বর ক্যাম্পে ১৯৭২ খৃঃ ২ সেপ্টেম্বর, একজন বন্দী তার শাস্তিকাল শেষ হওয়ায় পর সংক্রামক ব্যাধিতে মারা যায়। তার দেহটি আটক রেখে অন্য বন্দীরা মুক্তি, খাদ্য ও ওষুধের দাবী জানাতে থাকে। তারপর তারা শুরু করে অনশন। ১৬ দিন পরে ৫০০ শতেরও বেশী সংজ্ঞাহীন বন্দীকে অন্যান্য সেলে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিখোঁজের তালিকায় যায় অনেকের নাম।

তান হিয়েপ, থু ডাক এবং চি হোয়া থেকে প্রায় এক হাজার বন্দীকে কনসন পাঠান হয় ১৯৭২ খৃঃ ২ জুন। তাদের মধ্যে ছিল ৫০০ জন মহিলা। লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের গ্রেনেডের সাহায্যে তাদের সারিবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়। কনসনের ৪ নম্বর ক্যাম্পে উদরাময়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ৩০ জনের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানা যায়নি।

ছয়

কুখ্যাত চি হোয়া কারাগার :

১৯৬৮ খৃঃ ১৬ জুলাই। কারাগারের প্রধান তখন নগুয়েন ভন ভে। 'প্রধান বিশেষজ্ঞ' লো ভন খুয়ঙ (চিন খুয়ঙ) ৪ নম্বর ক্যাম্পের ১২০ জন বন্দীকে মহিষ খাঁচায় স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। এদের অধিকাংশই ছিল ক্ষয়রোগী, পঙ্গু অথবা হাত পা কাটা। এই 'মহিষ খাঁচা' গুলি পরিচিত ছিল স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধার কেন্দ্র হিসাবে।

এইসব অসুস্থ বন্দীরা ভাল খাদ্যের দাবীতে এক দুঃসাহসিক আন্দোলন চালায়। মাসে একদিন শূকরের মাংস। সপ্তাহে তিন দিন নিরামিষ খাদ্য এবং দশদিন অন্তর চালের পিণ্ড, কড়াইশুটি এবং চিনির দাবী করে। আন্দোলনে হুয়ান ভন টট মারা যায়। স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধার কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ পাওয়ার পর, ওদের ধারণা হল, হয়ত এবার তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু ওরা বিস্মিত হল : একটি ১২×৮ মিটার ঘরে রাখা হল ১২০ জন বন্দীকে। একজন বন্দীর জন্য এক বর্গ মিটারেরও কম জমি পড়ে। সেলের দেওয়ালের ওপরে ছিল কাঁটা তার বসান ফাঁকা জায়গা। সিমেন্টের মেঝে সব সময় ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। বর্ষার দিনে ছাদের ওপর জমা জল দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে আসে। বন্দীদের পক্ষে ঘুমানই ছিল দুঃস্বপ্ন।

...ক্যাম্পের প্রধান বা ভঙ একদিন বন্দীদের জানাল : "যারা এখান থেকে মুক্তি চাইবে, তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একটি বড় জেলে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভাল খাবারও পাবে; তা নাহলে, সব কিছুই হবে তোমাদের পক্ষে অসহ্য।"

সমস্ত বন্দীকে, যত দুর্বলই সে হোক না, তাদের ওপর কর্তৃপক্ষের অত্যাচার চালাবার অভিপ্রায় সে সকলকে এই ভাবেই বুঝিয়ে দেয়। মোদ্দা কথা, স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধার কেন্দ্রগুলিতে কঠোর শ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালান হয়।

৪ নম্বর ক্যাম্পের ১২০ জন বন্দী কাজ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাদের মাংস, সব্জী এবং চিনির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। দুমাস ধরে তাদের দেওয়া হয় ভাত এবং লোনা মাছ। চল্লিশ ভাগ বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাতের বেলায় কমপক্ষে দুবার সাহায্যের আবেদন জানানো প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে ওঠে। টাটকা সব্জীর অভাবে অর্ধেক বন্দী আক্রান্ত হয় বেরীবেরীতে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা টিকটিকি অথবা লনের ঘাস খেতে থাকে।

তখন ক্যাম্প প্রধান নোটিশ জারী করে: 'ঘাস খেয়ে কয়েকজন বন্দী সরকারের ক্ষতি করেছে। এ ধরণের আচরণ জেল কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন না। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পাবে। 'তারপর একটি ভয়ঙ্কর মন্তব্য: "এইসব ঘাস সরকারী সম্পত্তি; তোমরা পতাকাকে সম্মান জানাও নি। সরকারের প্রতি তোমাদের বিরোধিতার এটা হল প্রমাণ। সুতরাং তোমরা ঘাস খাওয়ার দাবী করতে পার না।"

তারপর লনের ঘাস কেটে ফেলা হয়। বন্দীরা একটি গাছের পাতা খেতে শুরু করে। কিন্তু ট্রাট টু (শৃঙ্খলারক্ষী বাহিনী) গাছটি কেটে ফেলে।

চি হোয়া কারাগারে বন্দী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ছিল লী কঙ গিয়াঙ। সায়গন স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সে ছিল প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান। সায়গন পৌর পুলিশ ১৯৭১ খৃঃ ৫ অগাস্ট তাকে গ্রেফতার করে। তখন সে বাড়ী ফিরছিল ক্লাশ শেষে। সেই

রাতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় চোখ বেঁধে, হাতকড়া পরা অবস্থায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর শুরু হয় নির্মম পীড়ন ও জিজ্ঞাসাবাদ। সে যে একজন ভিয়েত কঙ সেই স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চলে। মাথা, বুক, ঘাড়, হাটু, পা এবং পায়ের পাতায় মুগুর দিয়ে ক্রমাগত পেটাতে থাকে। স্তনের বোটা, নাভি ও পুরুষাঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরে। আঙুলের মাথায় পিন ফুটিয়ে দেয়।

পায়ের, হাতের নখ উঠিয়ে দেওয়া হয়।

নাক ও মুখের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণ সাবান জল ঢুকিয়ে দেয় জোর করে, যতক্ষণ না সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর পিঠের ওপর জোরে লাথি মারতে থাকে, সেই জল বের করে দেওয়ার জন্য।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের পর্যবেক্ষক টীমের চোখ এড়াতে অগাস্ট মাসের শেষে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয় একটি ঢাকা ট্রাকে করে।

এখন গিয়াও কথা বলতে পারে না। অবিরত রক্ত বমি করে। তার ছেঁড়া জামাকাপড়ে রক্ত শুকিয়ে এমন দুর্গন্ধ বেরোয় যে প্রহরীদের পর্যন্ত বমি উঠে আসে। সে পড়ে আছে মৃত মানুষের মত।.....

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অন্যতম নরকের নাম হল 'প্রেক্ষাগৃহ'। বধ্য ভূমির কাছ ঘেষে অবস্থিত এটি। ফায়ারিং স্কোয়াড এই বধ্য-ভূমিতেই নগুয়েন ভন ট্রয়কে হত্যা করেছিল। মার্কিন সাংবাদিক ডন লুইসের মতে 'প্রেক্ষাগৃহে' বাঘের খাঁচার থেকেও জঘন্য আচরণ করা হয়। জাপানী ফ্যাসিস্ত ও ফরাসী উপনিবেশিকদের আমলে এগুলি তৈরি। জাপানী ফ্যাসিস্তদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মরচে ধরা ভারী শিকলগুলি সায়গন শাসকরা ব্যবহার করছে রাজনৈতিক এবং স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের ওপর। 'প্রেক্ষাগৃহে' নিয়ে যাওয়ার পর বন্দীদের পোশাক খুলে নিয়ে পা বেঁধে দেওয়া

হয় লোহার রডের সঙ্গে। মশা ছারপোকা ও পিঁপড়ের অত্যাচার চলে তাদের ওপর। এইসব উৎপাতকে এড়ান বন্দীদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ওদের হাত এমন অত্যাধুনিক মার্কিন হাত কড়ায় আটকান থাকে, যার ফলে কোনদিকেই হাত ঘোরান অসম্ভব। ১৯৭২ খৃঃ ১০ ডিসেম্বর, জেলাধ্যক্ষ লেফন্যাণ্ট কর্ণেল নগুয়েন ভন ভে-র নির্দেশ কোন কারণ ছাড়াই সমস্ত বন্দীকে 'প্রেক্ষাগৃহে' আটক করা হয়। ছাত্ররা আটক ছিল প্রায় একমাস। রাজনৈতিক বন্দীরা এখনও সেখানে আছে।

দুজন ফরাসী শিক্ষক মেনরস্ ও ডেনরিস এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। স্কুল ও কলেজ ছাত্র, রাজনৈতিক বন্দী, এদের মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল, প্রায় ৮০০ জনকে পাঠান হয় পাওলো কনডরে। শোনা যায়, বন্দীরা দ্বীপে যাওয়ার পথে বিদ্রোহ করে। জাহাজের বৈদ্যুতিক জেনারেটরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং জাহাজ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাদের ওপর চলে বীভৎস অত্যাচার।

সায়গনের থাব দাও ওয়ার্ক-এ সামরিক আদালতের সম্মুখীন হতে হয়েছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের। এদের বেশীর ভাগ ছিল অসুস্থ। পাকস্থলীর পীড়া এবং ক্ষয়রোগে আক্রান্ত বন্দীরা নির্যাতনে শোচনীয় অবস্থায় পড়ে। ছাত্র নগুয়েন নগক ফুয়ঙ মারা যায়।

চান্দ্র নববর্ষে গ্যাস মুখোস, অত্যাচারের উপকরণ, এম. ১৬ বন্দুক ও বেয়নেট নিয়ে ফিল্ড পুলিশ চি হোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বর্বর হামলা চালায়। নতুন হাসপাতালের কাছে (এখানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম মহিলাদের বাঁচার দাবী কমিটির প্রেসিডেন্ট নগো বা থান বন্দী ছিলেন) গুলি চালায় এবং লোকভর্তি ওয়ার্ডগুলিতে গ্যাস গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। সমস্ত বন্দীই আহত হয়। বহু বন্দী জ্ঞান হারায়। তারপর রক্তাক্ত দেহগুলো টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। পেরেক লাগান বুট দিয়ে বেদম লাথি মারতে থাকে। মোটা

লাঠি ও রাইফেলের বাট দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে। বন্দীদের আর্ত চীৎকার হৃদয় বিদারক হয়ে ওঠে।

অচেতন বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয় 'প্রেক্ষাগৃহে'। পায়ে শিকল বেঁধে ফেলে রাখা হয় তাদের। ওদের যা কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, সবই চুরি হয়ে যায়। এমনকি পবিত্র চান্দ্র নববর্ষ উৎসবের সময়ও বন্দীদের ওপর নৃশংস হামলা বন্ধ হয়নি। রাতের বেলায় তারা ভাল খাবার ও বাসস্থানের দাবীতে চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু সে আবেদনে কর্ণপাত করে নি কেউ!

জেনারেল পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে নতুন ছাত্রী বন্দীদের এনে নির্জনে আটক রাখা হয়। তাদের বেশীর ভাগেরই কালশিটে পড়া মুখ, অথবা গাল ফুলে উঠেছে।

জাতীয় আত্মাধিকার আন্দোলনের চেয়ারম্যান আইনজীবী নগুয়েন লঙ এবং লেখক থিউ সনের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। লঙের বয়স ৬০। একচোখ সম্পূর্ণ অন্ধ, আরেক চোখে বাপসা দেখেন অত্যাচারের ফলে। থিউ সনের ভয়ঙ্কর হাঁপানি। সেই সঙ্গে হাই ব্লাড প্রেসার। খুঁড়িয়ে হাটেন সব সময়।

যেসব বন্দী কোন রকম প্রতিবাদ জানায়, সব সময়ই তাদের জন্য অপেক্ষা করে খনীরা। যে সব মহিলা বন্দী রক্তক্ষরণে ভোগে, আগে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত মূল ভূখণ্ড সায়গনে। এখন এদের এ এইচ শাখার কাছে অস্থায়ী ওয়ার্ডে নিয়ে জমা করা হচ্ছে।

এদের পরবর্তী দিনগুলি কী বিভীষিকাময় তা এখনও অজানা!

চি হোয়া কারাগার থেকে ১৯৭২ খৃঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টস্-এর প্রেসিডেন্ট একখানি চিঠি লেখেন কানাডার কুইবেকে, ইন্দোচীন সংক্রান্ত একটি সম্মেলনে। তার চিঠিতে ছিল:

.....সরকারের সন্ত্রাসবাদী নীতির অন্য উল্লেখযোগ্য দিক হল বিরোধী পক্ষের সদস্য, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং অন্যদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার। আইনকানুনের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে, নারী শিশু ও বৃদ্ধ সহ হাজার হাজার মানুষকে ধরা হয়েছে। তাদের সোজাসুজি পাওলো কনডর এবং মধ্য ভিয়েতনামের উপকূলবর্তী অন্যান্য দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এর ফলে। বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ওপর আচরণই সব থেকে জঘন্য। পাঁচ বছর শাস্তি ভোগের পরও আইনজীবী ত্রুঙ দিন ডিজুকে জেলে আটক রাখা হয়েছে। বিনা বিচারে আটকে রাখা হয় আইনজীবী নগুয়েন লঙ, মহিলা আইনজীবী নগো বা থান, প্রতিনিধি ত্রান নগক চাউ, অধ্যাপক ত্রান তুয়াম নাম এবং আরো অনেককে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও হাজার হাজার রাজনৈতিকবন্দীকে জেলে রাখা হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনকারীদের প্রায় ১৫৩ জনকে সায়গন জেলে বন্দী করা হয়। তাদের কখনও বিচার হয়নি। থিউ সরকার এদের বিপজ্জনক উপাদান মনে করে। থিউ-এর নতুন নির্দেশনামানুসারে হুয়ে, কাম থো এবং দানাং-এ হাজার হাজার ছাত্র ও যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

নির্যাতন এবং মারধোর ১৯৭০ খৃঃ ব্যাপকভাবে নিন্দিত হলে, তার পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু এখনও তা চলছে। প্রায় সব বন্দী ছাত্রের ওপর চলে নির্যাতন ও প্রতিশোধমূলক ব্যবহার। বিশেষ করে ছাত্রীদের ওপর আচরণ সব থেকে ঘৃণ্য।

...বন্দীদের স্বাস্থ্য ও জীবনের যেন কোন দাম নেই! যেমন ধরুন, বন্দীকে প্রতিদিন দেওয়া হয় ৪০ পিয়েস্ত্রা (এক ডলারের চার ভাগের এক ভাগ) তার খাবারের জন্য; যার মধ্যে থাকে ৫০০ গ্রাম পচা ভাত, ১০০ গ্রাম সব্জী, কিছু মাছ। মাংস বা চর্বি তো দূরের কথা। জেলারদের চুরির কথা আমি উল্লেখ করছি না। বন্দীদের

জীবন সত্যই খুব জঘন্য। আপনারা নিশ্চয় পাওলো কনডরের বাঘের খাঁচার কথা শুনেছেন।

চি হোয়া কারাগার থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ক্যাথলিক ধর্মযাজক ফাদার চান তিনকে একখানি চিঠি লেখেন আইনজীবী নগুয়েন লঙ। গোপন পথে সেই চিঠি পাচার হয়ে যায়। এই চিঠিতে আছে:

...চি হোয়ার রাজনৈতিক বন্দীরা একের পর এক মারা পড়ছে। মৃত্যুর কারণ অবশ্য কনসনের মত অমানুষিক নির্যাতন নয়, বুকে মেশিনগান চালাবার মত ঘটনা নয়। বরং বলা যেতে পারে কনসনের বাঘের খাঁচায় দীর্ঘকাল কাটাবার অনুরূপ ওজি ও সেলের সব জন বন্দীর পা পঙ্গু, ক্ষয়রোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হল নির্যাতন ও নিষ্পেষণের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, ওষুধ ভিটামিন ও যত্নের অভাব। রাজনৈতিক বন্দীদের ধীরে ধীরে মেরে ফেলার জন্য তাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তিকে ধ্বংস করার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে চি হোয়া কারাগারের নতুন ডিরেক্টর হয়ে আসে কর্ণেল নগুয়েন ভন ভে। কন সন কারাগারের বাঘের খাঁচা ঘটিত ব্যাপার নিয়ে দুনিয়ার সংবাদপত্রে এর কুখ্যাতি প্রচারিত হয়ে পড়ে ইতিমধ্যেই। চি হোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে তার আগমনে প্রথম ঘটনা হল: প্রতিদিন ইয়ার্ডের মধ্যে চলাফেরার মতই আইন অনুযায়ী স্বীকৃত আত্মীয় স্বজনের সাপ্তাহিক দর্শনকে, কোন কারণ না দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া। ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হুয়ান তান মাম সহ ইডি, ওবি ১, ওবি৪, ও এইচ ১ এর ছাব্বিশ জন ছাত্র অনশন ধর্মঘট শুরু করে। আমরা বাইশ জন ছাত্রের কোন খবর পাইনি।

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম নগুয়েন থি বিনের

দেওয়া হয় (চাল এবং আগুন বাদে)। কিন্তু সরবরাহকারী ও জেল সুপারিনটেনডেণ্ট এর থেকে মোটা ভাগ কেটে নেয়। বন্দীদের খাদ্যের দুটি ভাগঃ তরকারির টুকরো বা কুমড়োর একবাটি ঝোল, যা হল হল প্রকৃত পক্ষে এক গামলা গরম জল এবং স্বল্প পরিমাণ লবণ যুক্ত মাছ। এ আবার ভাগ করে খেতে হয় পাঁচ জনকে। চালের পরিমাণও মাত্রাতিরিক্ত কম।

প্রতি বছর অথবা দুবছর অন্তর প্রতি বন্দীকে একটি কালো শার্ট এবং একজোড়া ছোট্ট প্যাণ্ট দেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে প্রতিটি ওয়ার্ড এত লোক ঠাসা ও গুমোট যে কেউ এর বেশী পোশাক পরার দরকার বোধ করে না। দু শতের বেশী বন্দীকে ছোট্ট ও সরু ঘরে ভরে রাখা হয়। সারারাত ধরে পাশাপাশি পড়ে থাকে তারা। লোকভর্তি ঘরে বন্দীরা সিমেণ্টের মেঝেতে অথবা ছেঁড়া মাদুরের ওপর পড়ে থাকে। কোন কম্বল মশারী বা বালিশ জোটে না।

দুঃসহজীবন, ঠাসাঠাসি করে বসবাস, জিজ্ঞাসাদের সময় জঘন্য প্রহার এবং কঠোর শৃঙ্খলা থেকে জন্ম নেয় মারাত্মক রোগের। বেশীর ভাগ বন্দীই এক বা একাধিক ধরণের রোগে ভোগে। ১,৫০০ অসুস্থ মানুষের জন্য একজন খিটখিটে ও বদমেজাজী নার্স বরাদ্দ। গুরুতর অসুস্থ বন্দীর জন্য বরাদ্দ কয়েকটি এপিসি বা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট। কেবলমাত্র বিশ্বস্ত বন্দীরা পায় ইনজেকশান বা বিশেষ সব ওষুধপত্র। একবার আমরা অসুস্থ বন্দীদের জন্য ভাল চিকিৎসার দাবী জানাই। নার্স উত্তরে বলেঃ

"এখানে আমরা রোগ সারাই চাষাদের পদ্ধতিতে।"

যদি ওরা মনে করে কারো অসুস্থতা গুরুতর নয়, তাহলে তার কপালে চিকিৎসাপত্রের বদলে জোটে চরম শাস্তি। ফলে অনেক বন্দী মারা পড়ে। যেমন, কুয়াঙ তিনের মিঃ ডুয়ঙ হো, যে ১৯৬৮ খৃঃ মার্চে সি-ওয়ার্ডে মারা পড়ে।

বাস্তব জীবনের মত বন্দীদের ধর্মীয় জীবনও অসার। আয়ুক্ষয়, সৃজন ক্ষমতা ও চিন্তাধারা বিনষ্ট করবার জন্য অনুসরণ করা হয় নানান পদ্ধতি।

নিয়ম রক্ষার জন্য সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ বসে। এর উদ্দেশ্য অবশ্য বন্দীদের সাংস্কৃতিক মনোন্নয়ন নয়, তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা (খুব স্বল্প সংখ্যক বন্দী এসব ক্লাশে যোগ দিতে পারে)। বিশেষ করে ইতিহাস এবং ভূগোল কিছুই শেখান হয় না। প্রকৃত পক্ষে বন্দীদের শেখান হয় কেবলমাত্র পড়তে ও লিখতে। ওয়ার্ডের মধ্যে নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করলেই পাঠান হয় 'নিরাপত্তা কক্ষে'।

বন্দীরা তাদের সব টাকা পয়সা দিতে বাধ্য হয় জেল কর্তৃপক্ষের এবং তাদের থেকে সপ্তাহে পায় পঞ্চাশ পিয়েস্ত্রা। এই সামান্য অর্থের জন্যও অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়।

জেলে নির্যাতনের বিচিত্র রূপ

তান হিয়েপের বন্দীরা বিচিত্র ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

বৃত্তিমূলক শিক্ষা : ওয়ার্কশপে বন্দীদের কয়েক রকম শিক্ষাদানের প্রকৃত স্বরূপ হল দর্শনার্থীদের ধোঁকা দেওয়া। লক্ষ্য হল বাধ্যতা-মূলক শোষণ ও নির্যাতন চালান। কেবলমাত্র দক্ষ দরজি, মাদুর তৈরী কারক, ইট প্রস্তুতকারক, ধাতু নির্মাতাদের নিয়ে যাওয়া হয় ওয়ার্কশপে। বাদবাকীরা তারা অসুস্থ বা বয়স্ক যেই হোক না কেন, তাদের দিয়ে পিঠে বহন করার কাজ করান হয়; যেমন ইট বা বালি টেনে নিয়ে যাওয়া, চুন বালি মেশান ইত্যাদি। যদি কোন বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এক দিনের বিশ্রাম চায় তাহলে এক দিন আগে তাকে দরখাস্ত করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে কারো পক্ষে আগেই জানা সম্ভব নয় সে কখন অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কোন বন্দী হঠাৎ অসুস্থ

হয়ে পড়লে, তাকে বিনা আপত্তিতে কাজে যোগ দিতেই হবে। কারণ, জেলখানার রীতি অনুসারে আপত্তির অর্থই হল বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। এ ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠান হয় 'নিরাপত্তা কক্ষে'।

প্রতিদিন সমস্ত বন্দীকেই কাজের মাঝে বিশ্রাম না দিয়ে একটানা আট ঘণ্টা খাটান হয়। এজন্য তাদের মাসিক ভাতা হল পঞ্চাশ থেকে একশ পিয়েস্ত্রা। যা হল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সব থেকে কম ভাড়ার সমান। এসব সত্ত্বেও জেল কর্তৃপক্ষ দাবী করে লভ্যাংশের শতকরা চল্লিশ ভাগ পায় বন্দীরা। যদি কখনও জানতে চাওয়া হয় এত কম ভাতার কারণ, তবে জেল সুপারিনটেন-ডেণ্টরা হাজার রকম অজুহাত দেখিয়ে বলেন: কম উৎপাদন হার, মেশিনপত্রের অভাব, খারাপ মেসিনপত্র ইত্যাদি।

জেলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের যাবতীয় টাকা পয়সা জেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে নেয়। পরিবর্তে তাদের দেওয়া হয় একটুকরো কাগজ। জেল কর্তৃপক্ষ এই টাকা খাটায় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে।

শাস্তি দানের কোন কেসই পর্যালোচনা করা হয় না, যদি সে-রকম কোন ঘটনা ঘটে তাহলে, সেটি অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি ত্বরান্বিত না করে, শাস্তি কালকেই বাড়িয়ে থাকে। যতকাল বন্দী আটক রাখা যায়, তাতে লাভ সুপারিনটেনডেণ্টদের। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় যারা, তারা সুপারভাইজার, আদেশ পালনকারী বা নির্যাতনকারীর কাজ করে নিজেদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে। এদের ক্ষেত্রে সৎ আচরণের অর্থ হল অন্য বন্দীদের প্রহার করা। এরা সুপারিনটেনডেণ্টের ইঙ্গিতে ও কথা মত কাজ করে। বন্দীদের দীর্ঘকাল আটক করে রাখার অর্থ হল সুপারিনটেন-ডেণ্ট কঠোর পরিশ্রমী এবং বন্দীদের ওপর কড়া নজর রাখে। আর তাদের দ্রুত উন্নতি ও পুরস্কার লাভ।

শাস্তি মূলক ব্যবস্থা

যে কোন অপরাধী, তা বড় বা ছোট, ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন শাস্তি দেওয়া হবেই। বন্দীদের ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। হাত পা বাঁধা থাকে, শিকলে দীর্ঘ দিন ধরে। কখনও কখনও জামা কাপড় খুলে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এইসব নির্যাতনে বন্দীদের দেহ সম্পূর্ণ প্যারালাইসড্ হয়ে পড়ে। 'শাস্তি কক্ষে' কাটাবার সময় তাদের মারধোর করবার পর দেওয়া হয় একদলা ভাত, কয়েক ফোটা লবণ। প্রতি মাসে বা দুমাস অন্তর একবার স্নানের সুযোগ দেওয়া হয়। তারা প্রাকৃতিক কাজ সারে সেলের মধ্যে।

১৯৬৯ খৃঃ মে মাসে নিরাপত্তা প্রধান নাগুয়েন ভন তাই-এর নির্দেশে কুয়াঙ নাম প্রদেশের হোয়া ভঙ জেলার হোয়া লাক গ্রামের নগুয়েন ভন হাইকে কয়েকজন দালাল পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদের জন্য সেই রাতে নাম দিনের মিঃ ত্রান খক ফি এবং চু চাই-এর কাও ভন দাক-এর নাড়িভুড়ি বের করে দেওয়া হয় লোহার সাহায্যে।

নিরাপত্তা প্রধান নগুয়েন ভন তাই এবং ইঞ্জি বিভাগের কর্পোরাল কচ ১৯৬৯ খৃঃ অক্টোবরে ডাক হোয়ার ছত্রিশ বছর বয়স্ক ফন ভন নগাইকে মেরে ফেলে পিটিয়ে।

ডাক্তার সার্টিফিকেট দেয় এদের মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক। এদের প্রকাশ্যে কবর দেওয়া হয়।

কনসনের প্যারালিসিস্ ও ক্ষয় রোগে আক্রান্ত শতাধিক বন্দীকে ১৯৬৯ খৃঃ শেষে এখানে পাঠান হয় চিকিৎসার জন্য। কিছুকাল বাদেই আবার তাদের ফেরৎ পাঠান হয় কন সনে। এদের কন সনে প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছা প্রতিরোধে সামরিক প্রহরীরা জ্বালা সৃষ্টিকারী চুন ও বমি উৎপাদনকারী গ্যাস গ্রেনেড

ব্যবহার করে। বন্দীরা জ্ঞান হারালে, তাদের লরী বোঝাই করা হয়।

রাতের পর রাত শাস্তিদান কক্ষ থেকে বন্দীদের যন্ত্রণাকাতর গোঙানী এবং শিকলের ঠুনঠান আওয়াজ অন্যদের হৃদয়ে বেদনা ও দুঃখের সৃষ্টি করে। এইসব মানুষ যন্ত্রণা, ক্ষুধা, ঠাণ্ডা ও তৃষ্ণায় ক্রমশ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

কোন দেশী বা বিদেশী প্রতিনিধিকেই জেল দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয় না। যখন কোন দাতব্য কেন্দ্রের প্রতিনিধিদল বা ব্যক্তি জেল দর্শনে আসে, তখন সুপারিনটেনডেণ্ট ও কর্মীরা তাদের প্রতারিত করবার ব্যবস্থা করে। ১৯৬৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে একজন বন্দী সাহসিকতার সঙ্গে জেলে বর্বর নির্যাতনের কথা জানিয়ে দেয় রেডক্রস প্রতিনিধি দলকে। পরে তাকে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

সাত

আমি ত্রান হুয়ে। বয়স ত্রিশ। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে তখন ছিলাম শিক্ষক এবং লেখক। হুয়া থিয়েন কারাগারে এইসব অভিযোগে আমাকে এক বছর আটক রাখা হয়: ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকানদের নৃশংস হস্তক্ষেপের নিন্দা করে সংবাদ নিবন্ধ লেখা; খুন, অত্যাচার, দেশপ্রেমিক ও নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করে মার্কিন ও সায়গন প্রশাসন যে বর্বরতা চালাচ্ছে—সে সম্পর্কে সংবাদ প্রচার, সাংস্কৃতিক ক্রীতদাসত্বের নিন্দা করা, দূষিত অস্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি, যা ভিয়েতনামী জাতির ধর্মীয় জীবন ও নীতিবোধকে ক্ষয় করছে ধ্বংস করছে তার স্বরূপ তুলে ধরা।

পুলিশ ও তার নির্যাতন যন্ত্রের মুখোমুখি সুদীর্ঘ দিনরাত কেটে গেছে আমার। তারা আমার সম্পর্কে যা প্রমাণ করতে ইচ্ছুক ছিল তা বারবার বলাবার চেষ্টা চালায়।

অন্য হাজার হাজার ভিয়েতনামীদের মত, তারা আমাকে আটক রাখে অবৈধভাবে। বিশেষ বন্দী নিবাসে দীর্ঘ আট মাস ক্ষুধা, শীত ও রোগের মধ্যে আমি পড়ে আছি। এই আট মাস ধরে আমি আশা ও প্রতীক্ষায় কাটাচ্ছি। আমার মনে হয় যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, শান্তি ফিরে আসবে। আর আমি এই দুঃস্বপ্নের নারকীয় জগৎ থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু এখন আশঙ্কা বেঁচে থাকবার মত শক্তি কী আমার অবশিষ্ট থাকবে। কি যে ঘটছে তার বিন্দু বিসর্গ আমি জানি না। আমি জানি না, এখন আমি নরকে না পৃথিবীতে। কাদের সঙ্গে বাস করছি তাও বুঝি না। মানুষ, না একদল নেকড়ের সঙ্গে আছি তাও বোধগম্য নয়।

সময়ে বাবার সঙ্গে মাঠে যেত। এমনই এক আনন্দ মূহূর্তে ১৯৬৮ খৃঃ এক দুপুরে চির সুন্দর পৃথিবী হয়ে যায় অন্ধকার। মাঠে কাজ করার সময় হঠাৎ অবিরাম ধারায় গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করতে থাকে। চি রক্তাক্ত দেহে মাঠে পড়ে থাকে। গোলাবর্ষণ শেষে সে মাঠ থেকে উঠতে পারে না। কোমর থেকে তার দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যায়। অবশেষে পাতের বেষ্টনী ও ক্রাচের সাহায্যে সে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

সায়গনের একটি বাড়ীর বারান্দায় তার নিকষকালো চোখ দুটো শূন্যে তুলে ধরে চি বলেছিল, "আমি এখনও জানি না কোন পক্ষ গোলাবর্ষণ করেছিল। তবে আমি বাঁচতে চাই, এখন আমার একমাত্র আশা হচ্ছে বাঁচার চেষ্টা করা।"

এ বাড়ীতে চি'র মত বহু অসহায় শিশু রয়েছে।

জনৈক বিদেশী চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ বলেন, চিয়ের মত এমন হাজার হাজার পঙ্গু শিশু আছে—যারা শুধু শারীরিক অক্ষমতাজনিত মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছে না; উপরন্তু সমাজের পক্ষে তারা আজ বোঝা। সমাজ সব সময় পঙ্গু ও দুর্বলদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে থাকে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে কমপক্ষে আট লাখ (পনের লাখও হতে পারে) শিশু তাদের মা, বাবা বা উভয়কে হারিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য আত্মীয় স্বজনের কাছে আশ্রয় পেয়েছে, তবে অসংখ্য শিশুর ভাগ্যে জুটেছে অনাথাশ্রম। এ সব অনাথাশ্রমে তিল ধারণের ঠাঁই নেই আর পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। তা ছাড়া অনেকে বেওয়ারিশ অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভিক্ষে করছে কুকুর, বিড়ালের মত। আবার অনেক সময় চুরিও করছে। জনৈক মার্কিন চিকিৎসক বলেন এটা জীবনের ট্রাজেডী আর এ ট্রাজেডীর পরিমাপ কোনদিন জানতে পারা যাবে না।

ভিয়েতনামের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বয়স পনের বছরের কম। তথাপি সায়গন সরকার এ সব পঙ্গু রুগ্ন, অনাথ শিশুর লালন-পালন বা পুনর্বাসন খাতে বরাদ্দ করেছে মোট জাতীয় বাজেটের মাত্র শতকরা এক ভাগ।

যুদ্ধে আহত শিশুদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা নগণ্য। হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রতি আট হাজার জন রোগীর জন্য মাত্র একজন চিকিৎসক। অপরদিকে চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে সামরিক চাকুরী পরিহার করার জন্য বা অর্থের লালসায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো সায়গনে ডঃ আর্থার বার্স্কি প্রতিষ্ঠিত ৫৪ শয্যার প্লাষ্টিক সার্জারী হাসপাতাল। হিরোশিমায় আণবিক বোমার আহত পঙ্গু ব্যক্তিদের সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা করে ডাঃ বার্স্কি সম্মান অর্জন করেছিলেন। বার্স্কির হাসপাতালের তিনতলা শিশু রোগীতে ভর্তি। এদের কেউ মাত্র ভাল হয়ে উঠেছে, কেউ অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় আছে।

চোদ্দ বছরের মেয়ে লীথি উট। আগুনে এর পা পুড়ে যায় এবং শ্র্যাপনেলের আঘাতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত। তার দেহে আরো প্রায় বারোটি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন পড়ে। সে বলে, 'মাঠে কাজ করার সময় আমি কয়েকটি বোমা দেখতে পাই। যেহেতু আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না, তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ফেলে দেই। আর তখনই বিস্ফোরণ ঘটে।'

সায়গনের মেয়ে লী-থি বু (১৩) বাড়ীতে খেলা করছিল। একটি বুলেট তার চিবুককে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে যায়। তার চিবুকে সাতবার অস্ত্রোপচার করা হয়।

সায়গনের কন্টিনেন্টাল প্যালেস হোটেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের শিকার

গত দশকের শিশুদের করুণ মর্মান্তিক অবস্থা। বহু বিকলাঙ্গ শিশু—অনেকে আবার অনাথ—পথচারীদের জুতা কালি করছে। কেউ বা গাড়ি ধুয়ে দিচ্ছে, ফুলের মালা বিক্রি করছে। অনেকে ভিক্ষে করছে, চুরি করছে, অনেকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছে।

এদেশের একজন কাউ। তার বয়স আট। তার বয়স যখন তিন, তখন থেকেই সে এ হোটেলের বারান্দায় বসে নাসপাতি বিক্রি করে। এ শিশু মেয়েটির জীবনে শৈশবকাল কখনও আসেনি। জন্মের পরই তাকে জঠরের জ্বালায় রোজগার করতে হচ্ছে। কঠোর জীবন সংগ্রামরত এই বাচ্চা মেয়েটির মুখের কাঠিণ্য এ ইঙ্গিতই করে যে তার কচি মুখে কখনও হাসি ফোটেনি। সে তার নিজের ডাকনাম পর্যন্ত জানে না। কেউ তাকে তার বর্তমান অবস্থা বা জীবন সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে কাঁধ নেড়ে শুধু বলে, 'ন্যাসপাতি কিনুন না একটা।'

এ ধরণের অসংখ্য ভাগ্যবিড়ম্বিত শিশু তাদের অতীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা প্রকাশ করে। তারা অতীত ভুলে থাকতে চায়। অতীত ভুলে গিয়ে তারা অতীতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চায়। দশ বছরের ডাউঙ্গেকে তার অতীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল তার নাম বলবে; কিভাবে সে একটি পা হারিয়েছে বা নাপাম বোমায় তার অপর পাটি ও হাত বিকলাঙ্গ হয়েছে তা সে বলবে না। রাস্তাই তার বাসস্থান, সেখানেই সে ঘুমায়। রাস্তার ইঁদুর তার সঙ্গী। কেমন করে আহত হয়েছে এ কথা জিজ্ঞেস করলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বলে, এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে চাইনে।

বার বছরের ছেলে নগুয়েন থান সন প্রথমে কিছুই বলে না। কিছুক্ষণ পর শুধু বলে, আমি জানি না কি হয়েছিল। তবে আমার বয়স যখন দুই তখন আমার এ অবস্থা।

ভিয়েতনামের অনাথাশ্রমের অবস্থাও করুণ। সেখানে এদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় না।

ভিয়েতনামের অনাথাশ্রমের এ করুণ অবস্থার পেছনে যে প্রাচ্যদেশীয় বিশ্বাস কাজ করছে, তা হল অনাথাশ্রমের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের আত্মীয়স্বজনের। ভিয়েতনামের সমাজ-কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ট্রান নগুয়েন ফিউ বলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা আর অনাথাশ্রম খুলবো না, কারণ আমরা চাই জনগণই এসব শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করুক।"

বহু অনাথ শিশু আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধানে আছে। তবে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, এ ধরনের প্রায় দেড় লাখ শিশু 'ভয়ানক অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে এবং জরুরি ভিত্তিতে তাদের চিকিৎসা ও সুশ্রুষার ব্যবস্থা করা দরকার।'

শিশুদের যত্ন সম্পর্কে সরকারের যে নীতি হোক না কেন—আজকের ভিয়েতনামে এসব অসহায়দের সাহায্য করার অতিরিক্ত দায়িত্ব জনগণ নিতে চায় না বা পারে না।

এসব হতভাগ্য শিশুদের মধ্যে করুণতম অবস্থা হলো পঁচিশ হাজার শংকর শিশুর। এদের অনেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর লোকের ঔরসজাত। শংকর শিশুর অনেকের গায়ের রং শ্যামলা। দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা কালো শিশুকে "নিকৃষ্টতর' বলে মনে করে। যদিও সরকারী নীতি এর বিরোধী। এমন কি যারা কালো শিশুকে ভালবাসে ও যত্ন নেয় তারা ভিয়েতনামে এদের (শিশুদের) ভবিষ্যত চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। জনৈকা মিসেস ভো. থি, নিন (যিনি তার মৃতা কন্যার কাল শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন) বলেন, "আমাদের সমাজের অন্যান্য শিশুর তুলনায় এ ছেলেটি ভিন্ন। আমি মনে করি একে যুক্তরাষ্ট্রেই ভাল মানাবে।"

এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবার পূর্ণ দায়িত্ব দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন পুতুল শাসক থিউয়ের। থিউ এখন আদৌ সুবিধাজনক অবস্থায় নেই! তাঁর বিরুদ্ধে জনতার আক্রোশ যত বাড়ছে, শোষণের মাত্রাও তত বেড়ে চলেছে।

সায়গনের মানববিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট থিউ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করেন না। প্যারিস শান্তি চুক্তি অনুসারে বন্দীদের মুক্তি দানের প্রতিও তার ভয়ঙ্কর অনিচ্ছা। কয়েকশ হাজার মানুষ সায়গনের জেলখানাগুলিতে বন্দী হয়ে পঁচছে। এখনও সেই সব নিরাপত্তা কমিটি সক্রিয়—তারা যে কোন ব্যক্তিকে বৈধ পরোয়ানা ছাড়াই রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক অজুহাতে গ্রেপ্তার করতে পারে। যে কোন ব্যক্তিকে তারা আটক করে রাখতে পারে কম পক্ষে দুবছর বা আরও বেশীকাল।

জন নিরাপত্তার অজুহাতে কত না আইনের কড়াকড়ি। এইসব ঝামেলা এড়াবার জন্য জনগণকে অবশ্য কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন, বাড়ীর সামনে শাসকদের পতাকা টাঙিয়ে রাখতে হবে, দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখতে হবে কমিউনিস্ট বিরোধী শ্লোগান। যে কোন ভাবেই সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেই হবে। এমন কি অজগাঁয়ের মানুষের ফটো তুলে নেয় পুলিশ। সরকারী প্রচার চালাবার সময় সায়গন শাসকের পতাকা হাতে প্রতিটি মানুষকে দাঁড়াতে হয় বাড়ীর সামনে। স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কোন সদস্য তাদের ফটো তুলে নেয়। ৩০০-৫০০ পিয়েস্ট্রা খরচ পড়ে ফটোর জন্য। আর তা বহন করতে হয় নাগরিকদের। এই ফটোতে ছাপ দিয়ে দেয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। যতবার পুলিশ তল্লাশীতে আসে ততবারই দেখাতে হয় এই ফটো।

কিছুকাল আগে প্রেসিডেন্ট থিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা

করেন। ঝামেলা এড়াবার জন্য এবং কিছু সুযোগ পেতে সেনা-বাহিনীর লোকেদের মত সাধারণ নাগরিকরাও এই পার্টিতে যোগ দেয়। যদিও স্বল্প কাল জন্ম হয়েছে, তবুও এই পার্টির সদস্য সংখ্যা কয়েক লাখের মত!

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষ, বিশেষ করে কৃষকদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি বন্দী শিবির এবং গ্রামে পার্টির কর্মী, পুলিশ অথবা সামরিক পুলিশ পাঠান হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারকে বলছে এই পার্টিতে যোগ দিতে। অস্বীকার করলেই তাদের কমিউনিস্ট সমর্থক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দেশের মধ্যে ঘুরতে পার্টি কার্ড দরকার। যার দাম আইডেনডিটি কার্ডের থেকেও বেশী।

জঙ্গী মনোভাবাপন্ন যুব সমাজকে নিষ্ক্রিয়করণের উদ্দেশ্যে একটি সমবেতকরণ ডিক্রিতে সাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট। এর ফলে আঠার থেকে ত্রিশ বছর বয়স্ক প্রতিটি মানুষকে, দৈহিকভাবে অশক্ত হলেও, নির্দেশমাত্র সমবেত হতে হবে। এরা সামরিক বাহিনীর কোন সুযোগ সুবিধা পায় না, অথচ এরা সামরিক আইনের আওতায় পড়ে। বিন্দুমাত্র বিরোধী মনোভাব দেখলেই তাকে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে বাধ্য করা হয়।

সমস্ত পরিস্থিতি থেকে একটি জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, নতুন গ্রেপ্তারের পরিমাণ বেড়েছে এবং ঘটনার স্রোত দ্রুত জটিল হয়ে পড়ছে। যা চলে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট থিউ এর হাতের বাইরে।

সৈন্য পুলিশ আর জেলখানা—এই হল প্রেসিডেন্ট থিউ প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ১,১০০,০০০ সৈন্য এবং কয়েক শ হাজার পুলিশ ও অসংখ্য জেলখানা রাখা সম্ভব হয়েছে একমাত্র মার্কিন সাহায্যেই।

সায়গনের একজন ড্রাইভার বলেছিল, 'মার্কিন সাহায্য বন্ধ হওয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে থিউ সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে'। এটা কোন রসিকতা নয়। কথাটা যে কতখানি সত্যি, অন্যদের তুলনায় প্রেসিডেন্ট থিউ বোধকরি তা ভাল ভাবেই জানেন.। এ কারণেই সম্ভবত তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মার্কিন সাহায্য বন্ধ হলেই তিনি পদত্যাগ করবেন। সত্য কথা বলতে গেলে তার সেনাবাহিনীর ১, ১০০, ০০০ সদস্যকে তিনি কখনও ভেঙে দিতে পারবেন না, যতক্ষণ মার্কিন সরকার তাদের বেতন দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এদের কেবল বসে বসে আঙ্গুল মোচড়ান ছাড়া বলতে গেলে আর বিশেষ কোন কাজই নেই।

অনির্দিষ্টকাল ছুটিতে যাওয়ার আগে একজন সৈন্য বাহিনীর সার্জেন্ট মন্তব্য করেন: "প্রেসিডেন্ট জনগণকে ব্যারাকের মধ্যে আটক করেছেন কেবলমাত্র সৈন্য বাহিনীর লোক বাড়াবার জন্য নয়; এর কারণ সেনা বাহিনী হল একটি বৃহৎ কারাগার, যেখানে ভবিষ্যৎ-বিরোধীদের আটক রাখা হয়।" শহরের অধিকাংশ মানুষই জানেন যে, প্রেসিডেন্ট থিউ তার জেলখানা থেকে অসংখ্য মানুষকে, মুক্তি দেবেন না। অথবা প্যারিস চুক্তির ১১ নম্বর ধারা অনুসারে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও দেবেন না।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম আজ এক জটিল ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যুদ্ধবাজ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু বৎসর ধরে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্যবহার করছে আগের মতই। তাঁবেদারদের সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে নয়া উপনিবেশ বজায় রয়েছে।

প্যারিস শান্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও নীতিকে অগ্রাহ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ চক্রকে সমর্থন জানাচ্ছে

নানাভাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে বারবার। অথচ প্যারিস চুক্তিতে দু পক্ষই মেনে নেয় দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুটি সরকার, দুটি সেনাবাহিনী এবং তিনটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব। দক্ষিণ ভিয়েতনাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে ত্রিশটি দেশ স্বীকৃতি জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক মর্যাদা বেড়েছে বিপুলভাবে। প্যারিস শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বিপ্লবী সরকার। সেই স্বাক্ষরিত চুক্তি আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিক দল, জনসংগঠন, ধর্মীয় সংস্থার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে এই সরকারের পিছনে। বিপ্লবী সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিস্তৃত অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে।

তা সত্বেও পতনোন্মুখ জন বিরোধী থিউকে বাঁচাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়া-উপনিবেশবাদী পরিকল্পনা নিয়েছে। অথচ দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষের কাছে থিউ একজন বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পরিচিত। এই লোকটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিদেশীর কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন। এই ভাড়াটে ঘাতক কেবল নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে নিবৃত্ত হয় নি, প্রতিবেশী লাওস ও কম্বোডিয়ায় হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে খুন করেছে। প্রেসিডেন্ট থিউ-এর যাবতীয় অপকর্মের জন্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা।

যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সায়গনের তাঁবেদার সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনী ব্যাপক নির্যাতনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন করে ব্যাপক হারে গোলাগুলি বর্ষণ করে মুক্তি বাহিনীর ওপর। দৈনিক শতাধিক সামরিক অভিযানে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু ভাবে কাজ চালানও অসম্ভব হয়ে

পড়ে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কারাগারে এখনও বন্দী জীবন কাটাচ্ছে অসংখ্য ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিক, নিরীহ মানুষ।

জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভন থিউ বলেছিলেন: আমি জানি না এই শান্তি স্থায়ী হবে কিনা, অথবা কমিউনিস্টরা তা বানচাল করে দেবে কিনা। তবে নিদেনপক্ষে এটা ধ্বংস ও মৃত্যুর একটা পরিসমাপ্তি বলা যায়।

সায়গনের থিউ সমর্থক পত্রিকা তিন সং-এ পুলিশ বাহিনীর প্রতি প্রেসিডেন্ট থিউ-এর নির্দেশ প্রকাশিত হয়। দশটি নির্দেশ হল:

● ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরতির পর কোন কমিউনিস্টকে রাস্তায় দেখামাত্র গুলি করা হবে;

● কমিউনিস্টদের সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করতে হবে;

● সমস্ত গোপন রাজনৈতিক সমাবেশ ভেঙে দিতে হবে;

● কমিউনিস্টদের পতাকা কেড়ে নিতে হবে।

● কমিউনিস্টদের নথিপত্র, সার্টিফিকেট, অস্ত্রসস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

● জনসাধারণকে কেউ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করলে তাকে গ্রেপ্তার ও বিচার করা হবে।

● কমিউনিস্টদের মিছিল দমন করতে হবে।

'তিন সং' পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয় যে, বেসামরিক কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টা কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যারা এই নির্দেশ মানবে না বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সায়গনে এখন রাত এগারটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত কারফিউ।

মুক্তাঞ্চলে ব্যাপকহারে তাঁবেদার সৈন্যদের হামলা শুরু হয়ে

যায় এমন কি উত্তর ভিয়েতনামী প্রতিনিধিদের ওপর কয়েকবার হামলা চালান হয় আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে। তাঁবেদার কারাগার থেকে বন্দীদের অনির্দেশ্য স্থানে পাঠান হতে থাকে হত্যার উদ্দেশ্যে। মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনে বাধার সৃষ্টি করা হতে থাকে।

যুদ্ধ বিরতি কার্যকরী করার পক্ষে এই কার্যধারা নিঃসন্দেহে অনুকূল নয়। দেশকে শাসন নয় শোষণই যেখানে মূল লক্ষ্য সেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না শেষ পর্যন্ত। আর সায়গন সরকার যে প্যারিস শান্তি আলোচনার ফলশ্রুতি, আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকাশ্যে অবমাননা করে চলেছে, তার পিছনে কার সক্রিয় উসকানি রয়েছে তা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। মার্কিন কংগ্রেসে থিউ সরকারকে নতুন তিনশত মিলিঅন মার্কিন ডলার সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বজনমতে এর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে ব্যাপক-ভাবে। সায়গনের কয়েকজন বিরোধী এমপি বলেছেন এর ফলে "ক্রমবর্ধমান সাহায্য মিঃ থিউকে দক্ষিণ ভিয়েতমামী জনগণকে দমন করে রাখার পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করবে মাত্র। বেশী সাহায্য মানেই বেশী কারাগার, মিঃ থিউ-এর সুযোগ বাড়ান মানে হল দমনমুলক শাসন কাল বৃদ্ধি।"

প্যারিস শান্তি চুক্তি ও তার শর্ত পালনে সায়গন কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন সরকার নিদারুণ উদাসীন। স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা, বন্দীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে, আরও নৃশংস হয়েছে ওদের কার্যকলাপ।

প্যারিস চুক্তি সম্পর্কে বন্দীদের কিছু জানতে দেওয়া হয়নি। শান্তির কথা বললেই, বন্দীদের ভাগ্যে নির্যাতনের সীমা থাকে

না। ৬ ফেব্রুআরি দুশত রাজনৈতিক বন্দীকে নিরাপত্তা বিভাগে নিয়ে গিয়ে নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা হয়। রাত দিন হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয় প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে কয়েকজন।

তাছাড়া শান্তি চুক্তির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে অপপ্রচার চালায় জেল কর্তৃপক্ষ। বন্দীদের মনে সন্দেহের জাল ছড়িয়ে, তাদের আক্রোশ বাড়িয়ে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মাত্রা বৃদ্ধি করে। এই সঙ্গে পাঠায় ভাড়াটে প্রশ্নকর্তা—সাধারণ বন্দীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া নিরাপত্তা রক্ষী—যারা তাদের নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গেয়ে যায়। একবার ওরা সমস্ত সেল তালা বন্ধ করে একমাত্র খাদ্য হিসাবে ফেলে দেয় পঁচা মাছ। নয় নম্বর ক্যাম্পের প্রতিটি সেলে নববর্ষের উপহার হিসাবে ফেলে দেয় দুই বাক্স ভর্তি পশু মল। এক নম্বর ক্যাম্প বন্ধ করে দেয় নিশ্ছিদ্র ভাবে। স্পেশাল পুলিশের লোকেরা দুই নম্বর ক্যাম্পে ঢুকে নির্দয় নিপীড়ন চালায়। চার নম্বর ক্যাম্পের সকলেই মহিলা। এদের সাতজন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় নিরাপত্তা ব্যুরোর অফিসে। সেখানে মারধোরের পর প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের আগেকার তারিখে সই করতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তাদের ফটো ও আঙ্গুলের ছাপ ছিল। লেখা ছিল তারা সমবেত হয় সায়গন পক্ষে। তিনটি সাক্ষরিত দলিলে কিছু লেখা ছিল না। যা পরে জেল কর্তৃপক্ষ পুরণ করে দেয়। বিভিন্ন অত্যাচারে আহত বহু মহিলা এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে যাদের চিকিৎসা সম্ভব নয়; আর তাদের আটক রাখা হয় অন্ধকার ছোট্ট ঘরে রাত দিন।

নারী, বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষের তিনশ জনের একটি দলকে ১২ ফেব্রুআরি থেকে এক অনির্দিষ্ট স্থানে পাঠাতে

থাকে। বিমানে ওঠবার আগে তাদের জেল থেকে মুক্তিলাভের কাগজে সই নিতে বলেছিল। এদের কোন খবর পাওয়া যায় নি। এইভাবে বন্দী অপসারণ এখনও চলছে। কিছু বন্দী আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পর্যবেক্ষকদের সামনে ছাড়া জেলখানা ত্যাগে আপত্তি জানালে তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়। মারপিট চলে বর্বরভাবে।

না ত্রাঙ জেলের চারশ রাজনৈতিক বন্দীকে ১৬ ফেব্রুআরি কনসনে পাঠান হয়। এর আগে অবশ্য তাদের জেল থেকে মুক্তির ছাড়পত্র সই দিত বাধ্য করা হয়েছিল।

১১ মে চালু করা নতুন সামরিক আইনে যে নয়টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার জন্য পুলিশ যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা স্থান তল্লাসী করতে পারে।

ধর্মঘট এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর ছাপা জিনিস (সংবাদপত্র বই বা পুস্তিকা) প্রচার বা সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়। একজন সরকারী কর্তাব্যক্তির মতে যাবতীয় 'সার্বিক স্বাধীনতা সংকুচিত।' ব্যাপক গ্রেপ্তার এবং আটক আইন সিদ্ধ করা হয়েছে এই নীতিতে 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।' এ অবশ্য কোন আইনে বিধিবদ্ধ নয়। কর্তৃপক্ষ মর্জিমত ব্যাখ্যা করে।

যে কোন রকম সংগঠন, তা রাষ্ট্রের পক্ষে যত কম ক্ষতিকারকই হোক না কেন, সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

সাদা পোষাকে পুলিশ বা তাদের এজেন্ট যে কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করে কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই। অপহৃত ব্যক্তিকে সরিয়ে ফেলা হয় অজানা কোন স্থানে। অনেকেই জানতে পারে না তাদের গ্রেপ্তারের কারণ। গণঅভ্যুত্থান দমনের উদ্দেশ্যে গোটা এক একটি পরিবারের স্থান ঘটে জেলখানায়ঃ কারণ তারা 'ভিয়েতকঙদের প্রতি সহানুভূতিশীল।' যেমন হুয়ের ১,৫০০ জনকে

কনসন কারাগারে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়. 'রাজনৈতিক কারণে।' এইসব বন্দীদের মধ্যে আছে নারী ও শিশু।

থিউ এত করেও নিশ্চিন্ত হলেন না। বিরোধী সদস্যদের অনুপস্থিতিতে ২৭ জুন সিনেটে সংখ্যালঘু স্বপক্ষীয় সদস্যদের সমর্থনে ছয় মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করেন নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও বৈষয়িক ও আর্থিক স্বার্থে। যে সময় দুজন বিরোধী সিনেট সদস্যকে শহরের বাইরে সরিয়ে ফেলা হয়। আর একজনকে দেওয়া হয় হত্যার হুমকি। সে সময় থেকে—ডিক্রি জারী করে তিনি দেশ শাসন করতে থাকেন এবং বছরের শেষ পর্যন্ত ষাটটি আইন জারী হয়।

শ্রমিক ধর্মঘট এবং সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য নিষ্ঠুর আইন জারি হয়েছে। ১৫ জুলাই যে ডিক্রি জারি করা হয় তার ৪ নং ধারা অনুসারে যে কোন ধর্মঘটীকে ছয় দিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আটক রাখা যাবে এবং জরিমানার পরিমাণ হবে পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ পিয়েস্ত্রা। কিন্তু প্রতি শ্রমিকের মাসিক গড় আয় খুব বেশী হলেও বার হাজার পিয়েস্ত্রা। এই ডিক্রির ৯ নং ধারা অনুসারে 'জনগণের নিরাপত্তার এবং আইনের পক্ষে ক্ষতিকারক' কোন বিক্ষোভ সংগঠনকারী বা অংশগ্রহণকারীকে এক মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আটক রাখা যাবে।

যানবাহন চলাচলে বিঘ্নকারীকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করতে পারবে এবং যে কোন রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে তল্লাসী চালাতে পারবে।

প্যারিস শান্তি চুক্তি সাক্ষরের বিরোধিতা করেন থিউ। যুদ্ধ বিরতি আসন্ন হয়ে উঠতে থাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। থিউ এর নাতি হেয়াঙ ডাক না-র মন্তব্য থেকে জানা যায় সে সময় ধৃত বা নিহত 'কমিউনিষ্টের' সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ

হাজার। সরকারী বিরোধী যে কোন ব্যক্তিই ওদের মতে কমিউনিষ্ট। সে হিসাবে যাজক, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, নিরপেক্ষতাবাদী অথবা পুনর্মিলনের ভিত্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের শান্তি ও স্থিতাবস্থাস্থাপনের পক্ষপাতী প্রতিটি মানুষই থিউ-এর শিকার হতে থাকে। ১ জানুআরি লস এঞ্জেলস টাইমস মার্কিন সরকাবী সূত্রের খবর উদ্ধৃত করে জানায় যে ভবিষ্যতে যাতে তৃতীয় পক্ষ দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না গ্রহণ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে থিউ ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্মূল করার নির্দেশ দেন। আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিরোধিতাকে সমূলে ধ্বংস করতে থিউ-এর আচরণ ১৯৫৪ খৃঃ থেকে অনুসৃত যাবতীয় বর্বর আচরণের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতির ফলে সায়গন কর্তৃপক্ষ যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করতে থাকে। এর অপর কারণ জনগণের বিরোধিতা ধ্বংস করা। মে মাসে প্রচলিত নয়টি নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম হল সতের বছর বয়স্ক প্রত্যেক ভিয়েতনামীকে সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হবে। লা মণ্ডে ডিপ্লোমাটিকের অক্টোবরের সংবাদসূত্রে প্রকাশ: এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়; জুন মাসের মধ্যে শতকরা সত্তর জন ছাত্রকে সেনা বাহিনীর পোশাক গ্রহণ করতে হয়েছিল। গ্রেপ্তারের পর অথবা অল্পকাল জেলে কাটিয়েছে এমন, নতি স্বীকার করেনি বা অবাধ্য মানুষদের সর্বপ্রথম পাঠান হয় সীমান্তে। সীমান্তে কেউ 'শত্রুকে' গুলি বিদ্ধ করতে ব্যর্থ হলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করা হয় গুলি করে। বিদেশে শিক্ষারত ভিয়েতনামী ছাত্রদের সামরিক প্রয়োজনে ডেকে পাঠান হয় দেশে। প্রত্যাখ্যানের অর্থ তাদের জন্য দেশ থেকে টাকা পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি

বিদেশে ভিয়েতনামী ছাত্ররা সেই সব দেশে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলে তাদের সে দেশ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সব শিক্ষক তাদের পরিবারের লোকজনকে দেখতে যায়, তাদের ওপর আদেশ আসে অচিরাৎ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার। এই আদেশের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা হয় এবং সরকারী চাকুরিয়াদের বাছাইকরণের কাজ আরম্ভ হয়। 'বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টিকারীদের সামরিক আইনানুসারে বিচার হয়।

একটি ডিক্রিতে থিউ আদেশ দেন তেতাল্লিশ বছরের কম বয়স্ক প্রতিটি লোককে নাম লেখাতে হবে সেনা বাহিনীতে। পুলিশ যে কোন সময় বাজার, হোটেল, এবং থিয়েটারে প্রবেশ করে এবং বেরিয়ে আসে। পোশাক পরিহিত পুলিশ শহরের যে কোন স্থানে যানবাহন ঘিরে ফেলে এবং তার বয়সের প্রমাণ পত্র দেখালেও যে কোন ব্যক্তিকে সামরিক কাগজপত্র না থাকার অজুহাতে তখুনি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

যে কোন ধর্মের মানুষই থিউ-এর চোখে শত্রু। ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বা বৌদ্ধ কেউই রেহাই পায় না নির্যাতনের হাত থেকে।

গ্রাম প্রধান নির্বাচন করত সাধারণ মানুষ। কিন্তু নতুন আদেশে তাদের নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় প্রদেশ প্রধানের ওপর, যারা হলেন থিউ কর্তৃক নির্বাচিত সামরিক বাহিনীর লোক। আগে গ্রাম প্রধানের হাতে ছিল যে সব ক্ষমতা এখন তা প্রয়োগ করে গ্রামের পুলিশ।

এসব করার পিছনে থিউ-এর যুক্তি 'শাসন ক্ষমতা সুপরিচালনা' করা।

থিউ-এর মারাত্মক আঘাত পড়ে সংবাদপত্রের ওপর। দমন

মূলক আইনের চাপে নাভিশ্বাস ওঠে সায়গন সংবাদ জগতের।

অসংখ্য সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ, জরিমানা, কারাদণ্ড প্রদান করা হয় রিপোর্টার, সম্পাদক এবং রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের। ৪৩টি সংবাদপত্রের ৩০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এদের অপরাধ উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত একটি কারখানার ছবি প্রকাশ। তা ছাড়া জনৈক সায়গন সরকারী কর্মীর গণ তহবিল তছরূপ এবং বার বছরের একটি বালিকার ওপর বলাৎকারের সংবাদ প্রকাশ। এসব সত্বেও সায়গন কর্তৃপক্ষ সমালোচনার পথ রুদ্ধ করতে পারে নি। থিউ তার দমনের মাত্রা বাড়াতে থাকে।

পাঁচই আগষ্টের 'নতুন সংবাদপত্র আইন' চালু হয় ১ সেপ্টেম্বর। নির্দেশ ছিল প্রতিটি সংবাদপত্রকে কুড়ি মিলিঅন পিয়েস্ত্রা (আট-চল্লিশ হাজার মার্কিন ডলার) জমা অর্থ রাখতে হবে। কোর্টের জরিমানা এবং বিচারের খরচ হিসাবে এই টাকা থেকে কেটে নেওয়া হবে। প্রশাসন বা সি আই এ, এ আইডি বা কর্ডের অনুদানে পরিচালিত ছাড়া অন্য কোন পত্রিকার পক্ষে এই টাকা জমা দেওয়া অসম্ভব। বড় শাস্তি হল পাঁচ মিলিঅন পিয়েস্ত্রা জরিমানা এবং পাঁচ বছর জেল। যে কোন পত্রিকা যে কোন সময় বন্ধ করা বা জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত হতে পারে। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যে ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করে তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সুযোগ পর্যন্ত দেয় না।

'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা' এবং 'জনস্বার্থে' নাকি এসব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলা হয়ে থাকে সরকারী তথ্য বিভাগ থেকে সরকার পক্ষ থেকে কোন যুক্তি দেখাবার প্রয়োজনও বোধ করে না।

ব্যাপারটি হল: নতুন আইন অনুসারে থিউ বিরোধীপক্ষের সব মুখপত্র এবং সরকার সমর্থক পত্র পত্রিকা

বন্ধ করে দেওয়া। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পনেরটি দৈনিক এবং বহু সাময়িক পত্র বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন বিধি নিষেধে বিদেশী সাংবাদিকরাও নানান সমস্যার মুখোমুখি পড়ে। আগে বিশেষ সংবাদদাতারা তিন মাস অন্তর সায়গনে অবস্থানের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করত। নতুন আইনজারীর পর প্রতি মাসে অথবা দুই সপ্তাহ অন্তর পুনরাদেশ সংগ্রহ করতে হয়। চাকরিগত অসুবিধা ছাড়াও তাদের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এবারের চান্দ্র নববর্ষে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল নায়ক নগুয়েন ভন থিউ সেনাবাহিনী পুলিশ ও অতিরিক্ত সশস্ত্র বাহিনীকে সতর্ক করে দেন। উদ্দেশ্য বর্বর হামলা ও নির্যাতন চালিয়ে নিজের ক্ষমতা অটুট রাখা। এর ফলে প্যারিস শান্তি চুক্তির প্রতি চরম অসম্মান দেখান হয়েছে এবং যুদ্ধকে প্রলম্বিত করা হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের দু পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সমাধানকে পিছন থেকে বার বার আঘাত করেছে এই জনবিদ্বেষী সরকার। জানুআরি মাসের প্রথমে থিউ প্রশাসন সায়গনের পাঁচটি সংবাদপত্রের লাইসেন্স বাতিল করে দেয়। তাদের ছাপাখানা দখল করে, আঠারজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে। সরকার থেকে বলা হয় এরা 'কমিউনিস্ট এজেন্ট'-ঐ সব কাগজে অনুপ্রবেশ করেছে। আসল কারণ হল, ক্যাথলিক যাজক ত্রান হু থান-এর 'রাজনৈতিক অভিযোগ' প্রকাশিত হয়েছিল এসব পত্রিকায়। সায়গনের পুতুল প্রেসিডেন্টকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও শান্তির পরিপন্থী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়। প্রেসিডেন্ট থিউ-এর অবিলম্বে পদ ত্যাগ দাবী করা হয়।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, শহরগুলিতে প্রেসিডেন্ট থিউ-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভে ক্রমশ তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আরও নৃশংস হয়ে উঠতে থাকেন।

আট

এই সঙ্গে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের সামাদ্য চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। মাদাম থি বিন বলেছেন, এখনও শান্তি আসেনি সায়গনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলার দরুন। তবু চাষাবাদের এলাকা বাড়ছে। চরম যুদ্ধকালে পড়ে থাকা পতিত জমিতে এখন ফসলের সমারোহ। পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মধারা অনুসৃত হচ্ছে। আমরা স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন খুলছি। সায়গন প্রশাসন আমাদের শান্তিতে কাজ করতে দিচ্ছে না। তাই কৃষকরা রাইফেল আর লাঙল দুইই তুলে নিয়েছে। ফসল ফলাচ্ছে, গ্রাম, জনগণ ও ফসলকে রক্ষা করছে স্থল, নৌ ও বিমান হামলা থেকে। এ হলো পিআরজি—অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরের ছবি।

কিন্তু অস্থায়ী সরকার গঠনের আগে থেকেই চলে আসছে উৎপাদনের সংগ্রাম। মুক্তিফ্রন্ট ছিল যুদ্ধ এবং উৎপাদনের তত্ত্বাবধায়ক।

তখন যুদ্ধ চলছিল ব্যাপকভাবে। সর্বত্র হানা দিচ্ছে শত্রু। তার মধ্যেও মুক্তিফ্রন্ট সুবিধাজনক, উঁচু এলাকার চাষ ও পশু-পালনে নিয়োজিত করেছে কৃষকযোদ্ধাদের। নতুন চাষপদ্ধতি শেখান হয় যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেঞ্চের পাশাপাশি তারা খুঁড়েছে খাল ও নালা—সেচের জল সরবরাহের জন্যে।

মুক্তাঞ্চলে সেচ খালের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০০০ মাইল।

কামাউঘাটি এলাকায় ৬২১টি মাটির বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ করা

হয়। গিয়ারাই জেলায় ১৫০ মাইল খাল পুনর্খনন এবং ৪৫০টি সেচ পুষ্করিণী খনন করা হয়। ১৯৬৮ খৃঃ রাখগিয়া প্রদেশে খাল খুঁড়ে ৫০ হাজার ঘনমিটার মাটি তুলে ফেলা হয়। জমিতে জল রাখার বাঁধ তৈরী হয় অসংখ্য।

শুধু দূরান্তরের মুক্তাঞ্চল কেন, শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলার স্থায়ী রণাঙ্গনগুলোর কাছাকাছি মুক্তাঞ্চলেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে হয়েছে চাষাবাদ। গিয়াদিন প্রদেশের ট্রাং এন কমিউনের কৃষকরা জমিতে ভরা ফসল রেখে ছুটে গিয়েছিল শহরে, বিমান হামলায় তাদের সহকর্মী ১১ জনের প্রাণসংহারের শোধ তুলতে। প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে এল কাস্তে হাতে।

সশস্ত্র শত্রুর মোকাবেলার পাশাপাশি প্রাকৃতিক শত্রুর সঙ্গে জুঝেছে তারা। ৩৬০টি পরিবার অধ্যুষিত একটি গ্রামে নীচু লবণাক্ততায় অকেজো ৪০৯ হেক্টর জমি ছাড়া আর কিছু নেই। প্রতি বছর তাতে ঘাটতি পড়তো ৩।৪ মাসের খাদ্য। শত্রুরা গ্রামটি ঘেরাও করলে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। জমিতে আগাছা আর লোনা জল জমে মাঠটি হয়ে পড়লো চাষের অযোগ্য। অনেক লোক মারা গেল অনাহারে। ১৯৬২ খৃঃ মাঝামাঝি থেকে মুক্তিফ্রন্ট অনাহার থেকে গ্রামের বাসিন্দাদের রক্ষার কর্মসূচী নেয়। প্রথমে ৬০০০ কর্মদিনের পরিশ্রমে ২৮৪০০ ঘনমিটার লোনা কাদা সরিয়ে দেড় মিটার উঁচু, ২ মিটার প্রশস্ত ৮ মাইল বাঁধ বেঁধে স্লুপের জল এনে লোনা জল তাড়িয়ে শুরু হয় চাষ। এলো সার বীজ, চারা। হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ে তিনগুণ বা তারও বেশী। মুক্তিযুদ্ধকালেই শত্রুর এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে মুক্তি সেনারা গুদাম ভেঙে ইঞ্জিন, পাম্প, ট্রাক্টর নিয়ে আসতে মুক্তাঞ্চলে। প্রয়োজনে সারের জন্য নামতো যুদ্ধে। যেখানে সার নেই সেখানে অঢেল সবুজ গুল্ম অতি অল্প সময়ে পচিয়ে দেয়া হতে

জমিতে। মুক্তি বাহিনীর বেতারে চাষাবাদের পদ্ধতি শেখান হত। ১৯৬৫ খৃঃ অক্টোবরের মধ্যে ৩০ লক্ষ কৃষক গাঁতি ব্রিগেড (কর্ম বিনিময় দল) গড়ে তোলে। কোয়াংনান, ট্রা ভিন, কিয়েন কং, কা থো, ব্রে ত্রে, মাই থো, কা মাউ—এসব উচ্চভূমি এলাকার ৭০ থেকে ৯৮ ভাগ কৃষক সমবায়ে যুক্ত হয় চাষাবাদ করতে। এতে আবাদী জমি ও উৎপাদনের ফলন দুইই বাড়ে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম শুধু সারা ভিয়েতনামেরই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও শস্যভাণ্ডার। ১৯৩৯ খৃঃ পূর্বে নাম বো থেকে বিদেশে ১ লাখ টন ধান রপ্তানী হতো। ১৯৪০ খৃঃ ১৭ লাখ ৫৯ হাজার টন রপ্তানী হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে শস্য ভাণ্ডারগুলো হস্তগত করার দিকে মুক্তিবাহিনী আগে লক্ষ্য রাখে। পল্লী এলাকার পায়ের নীচে মাটি পায়নি সায়গন প্রশাসন। তাই তাকে এএফপির হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য তাঁবেদার দেশ থেকে সাড়ে ৭ লাখ টন, ৬ লাখ ৮০ হাজার টন, ৪ লাখ ৬৫ হাজার টন চাউল আমদানী করতে হয়।

ধানের পরেই মুক্তাঞ্চলে কাসাভার চাষ হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে। ১৯৬৩ খৃঃ পার্বত্যাঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীর ঘাঁটি এলাকাগুলিতে ১২ কোটি কাসাভা গাছ ছিল। প্রতিটি গাছে শর্করা আছে প্রায় ১ সের।

জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাঁতবস্ত্র, মাদুর, তৈজস, চিনি সংরক্ষিত মাছ, সাবান কারখানাও গড়ে তুলেছে মুক্তিফ্রন্ট সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য।

শুধু নিজেদের প্রয়োজন মিটানোই নয়, মুক্তাঞ্চল থেকে দখলীকৃত অঞ্চলে এসব সামগ্রীর চালান পাঠিয়ে তার বিনিময়ে যন্ত্রপাতি

এমনকি অস্ত্রশস্ত্রও কিনে এনেছে মুক্তিফ্রন্ট। মুক্তাঞ্চল মুক্তিফ্রন্টকে যুদ্ধের জন্য খরচ বাবদ ফসল বা অর্থ দেয়। 'খ' অঞ্চল ধার্যকৃত ১৫ লক্ষ ডং-এর স্থলে একবার ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ডং শস্য দিয়েছিল। উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে খাদ্য কিনে নিয়ে মুক্তিফ্রন্টের যোদ্ধারা শতমাইল দূরের ঘাটতি অঞ্চলে পৌঁছে দেয়।

এ হলো যুদ্ধবিক্ষত দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা। দেশপ্রেম, সততা, পরিশ্রম দিয়ে তারা অসাধ্য সাধন করেছেন। মুক্তাঞ্চলের অর্থনীতি এতই মজবুত যে, ২০ বছরের একটানা হামলাতেও তা ভেঙে পড়েনি। পক্ষান্তরে সায়গন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিশ্বের সেরা সমরবাদী ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদত সত্ত্বেও সব কিছুই দুর্লভ, মহার্ঘ। টানাপোড়ন সেখানে নৈমিত্তিক।

দেড় কোটি মানুষের দঃ ভিয়েতনাম ২০ লক্ষাধিক বিদেশ ও শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করেও ইতিমধ্যে যে উন্নতি স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন অনেক রাষ্ট্রের কাছে সেটুকুও অভাবিত।

বিশ শতকের ইতিহাসকে যারা কলঙ্কিত করেছেন, ভিয়েতনামের মানব বিদ্বেষী রাষ্ট্রনায়ক থিউ তাদের অন্যতম। সম্পূর্ণ বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে, স্বদেশভূমিকে বিকিয়ে দিয়ে যে ঘৃণ্য নিদর্শন তুলে ধরেন, তার দ্বিতীয় নজির যেন আর সৃষ্টি না হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের শবদেহ, হাজার হাজার সন্তান হারা মায়ের ক্রন্দন, লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ, অগনিত অন্ধ পঙ্গু ও অসহায় শিশুর চোখের জলকে অগ্রাহ্য করে যার বর্বর অভিযান চলেছিল, ইতিহাস তার নোংরা চরিত্রকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে আবর্জনার স্তূপে। কারণ জয় চিরকাল মানুষের স্বপক্ষে। আর ইতিহাসের গতিকে কখনও পিছনে ফেরান যায় না।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভিয়েতনামের মানুষ আজ শান্তি চায়। তারা লড়েছে দুযুগ ধরে ফরাসী জাপানী, মার্কিন এবং সবশেষে দেশীয় তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের পরিণতিতে ভিয়েতনামের নগরে, জনপদে, রণক্ষেত্রে সর্বক্ষণবক্ত ঝরেছে। এই মুহূর্তে শান্তিই এই এলাকার মানুষের এক মাত্র কাম্য হলেও, সদিচ্ছা কখনো এক পক্ষীয় হতে পারে না। শান্তি চুক্তির পরও মার্কিন মারণাস্ত্র সজ্জিত তাঁবেদার বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটি ৩ লক্ষ বার যুদ্ধবিরতি লংগন করে, ২ লক্ষ ৮০ হাজার বার হানা দেয় বিভিন্ন এলাকায়। তাই ৪৪টি প্রদেশের সদাজাগ্রত হাজার হাজার মুক্তি সেনা প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলে। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই চলতে থাকে। রক্ত ঝরে নতুন করে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্নরূপ গোপন নেই। লক্ষ লক্ষ ডলার, আধুনিক উন্নত অস্ত্র রক্ষা করতে পারল না তাদের মানববিদ্বেষী ব্যবসায়িক স্বার্থকে। ভিয়েতনামে এই মুহূর্তে যুদ্ধ শেষ। থিউ বিতাড়িত। সায়গন মুক্ত!

নতুন দিনের মানুষ কি ভুলতে পারবে ফেলে আসা ভরাবহ অতীতের দিনগুলি!